অগস্ট ২০০৬ ● দশ টাকা

আনন্দমেলা

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের দমফাটা হাসির কমিক্‌স (শেষাংশ)

আমার সম্পাদক শিকার

হাফ ডজন জমজমাট গল্প

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস (শেষাংশ)

শিকারবাড়ি রহস্য

জমজমাট উইথলডন

জিদানের জবাব নেই

আমরা জানি বাচ্চারা তরিতরকারী পুরোটা খায় না।
তাই, আমাদের পুষ্টি সম্পূরকে আমরা ভরে রেখেছি প্রকৃতির গুণাবলীকে।

এ প্রমাণিত। জৈবিক ভাবে ফলানো খাদ্যশষ্যে শ্রেষ্ঠতম পুষ্টিগত ফলাফল পাওয়া যায়। আর সেজন্যেই তো অ্যামওয়েতে, আমরা আমাদের খাদ্য সম্পূরক গুলিকে তৈরী করি একেবারে সরাসরি ক্ষেত থেকে আনা প্রকৃতি থেকে। আমরা যে সব উপাদান ব্যবহার করি সেগুলি ফলানো হয় আমাদের-নিজস্ব জৈবিক খামারে, যেখানে মাটি চাষ করে কেঁচো এবং গুবরে-পোকা জাতীয় পতঙ্গ কাজ করে কীটনাশকের। বস্তুত, নিরাপদ এবং প্রাকৃতিক এই দুটি শব্দই আমরা উত্তরোত্তর বহন করে চলি আমাদের উৎপাদনের সমস্ত সম্ভারের গোড়ার কথা হিসেবে। আমাদের সংক্রমণ নিরোধক এবং হাউসহোল্ড ক্লীনার গুলিতে থাকে কেবলমাত্র ত্বক-নিরাপদ উপাদান। আমাদের ফ্লোর ক্লীনার গুলিতে থাকে পাঁচবার ফিল্টার করা জল যা সচরাচর ব্যবহার করা হয় কফ সিরাপে। আমাদের উৎপাদনগুলি সৃষ্টি করা হয় 500-এরও বেশি উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের দল দ্বারা। এ সব জিনিষ আপনি স্থানীয় মুদি-দোকানে কোনদিনই দেখতে পাবেন না। অ্যামওয়ের কোন দোকান নেই, নেই কোন দোকানদারও। আছেন একগুচ্ছ মানুষ, যাঁরা তাঁদেরই মত স্বমতাবলম্বী কিছু মানুষ কে তাঁদের গোষ্ঠীতে নিয়ে আসেন। আপনার মত মানুষদের। আরও বিশদ ভাবে আমাদের সম্বন্ধে জানতে লগ অন করুন www.amwayindia.com

CUSTOMER SATISFACTION 100% OR MONEY REFUNDED

Amway™
BETTER iDeaS. BETTER LiFe.

•Nutrition & Wellness •Cosmetics •Home Care •Personal Care •Insurance | www.amwayindia.com

আনন্দমেলা

৩২ বর্ষ ৪ সংখ্যা শ্রাবণ ১৪১৩ জুলাই ২০০৬

হাফ ডজন জমজমাট গল্প

গুপিচোরের কাণ্ড ১১ সাথী সেনগুপ্ত
গল্পটা শুধুই শীলার ১৫ আবদুল্লাহ-আল-মাসুম
ঝঞ্ঝাটপুরের চোর ৪৩ সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়
একশোয় একশো ৪৮ সমীরণ রায়
নাঙ্গা পাহাড়ের মমি ৫১ সুখলতা মজুমদার
যুদ্ধ ফেরত বাঞ্ছাদা ৫৫ সুব্রত ভট্টাচার্য

অন্যান্য পাতায়

ডাকবাক্স ৪
পাঠকের পাতা ৬
বিজ্ঞানের টুকিটাকি ৭
ক্যাম্পাস ৯
কুইজ ১০
নানারঙের রামধনু ৪২
অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো ৫৮
হাসছি দ্যাখো ৫৮
অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৫৯

প্রচ্ছদ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের মজাদার কমিক্স

আমার সম্পাদক শিকার ১৮

নবীন লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা যখন সব পত্রপত্রিকা থেকে ফেরত আসতে শুরু করেছে, তখন একদিন তিনি 'মেদিনীপুর কৃষিতত্ত্ব' পত্রিকার দপ্তরে গিয়ে হাজির। এই কৃষি পত্রিকার সম্পাদক শিবরামের লেখা মনোনীত করলেন। এর পর সম্পাদক মাসতিনেকের ছুটি নিয়ে ঘাটশিলায় হাওয়া বদলাতে গেলেন। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন শিবরামকে। কী হল তারপর? শেষাংশ এই সংখ্যায়।
ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস (শেষাংশ)

শিকারবাড়ি রহস্য

শুভমানস ঘোষ

২৮

খেলাধুলো

রোমে গেল বিশ্বকাপ ৬২ সন্দীপ দাশগুপ্ত
দুই ভূমিকায় সফল দ্রাবিড় ৬৩ অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়
জিদানের জবাব নেই ৬৪ সুমন সেনগুপ্ত
জমজমাট উইম্বলডন ৬৫ শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
ফ্রিস্টাইল ৬৬ চন্দন রুদ্র

সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

'পাঠকের পাতা'য় ভুল

আমি 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক। জুন সংখ্যায় 'আনন্দমেলা'য় একটি ভুল চোখে পড়ল। 'পাঠকের পাতা' বিভাগে 'এবারের প্রতিযোগিতা'য় 'বর্ষার ছবি' সম্পর্কে লেখা ছিল যে, সেরা কয়েকটি ছবি আমরা জুন সংখ্যায় ছাপব। কিন্তু ২০০৬-এর জুন সংখ্যা আবার কীভাবে ছাপা হবে, তা বুঝলাম না।

শুভঙ্কর ঘোষ

নবম শ্রেণি, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (মেন)

সম্পাদকীয় উত্তর: তুমি ঠিকই লিখেছ, ভুল হয়েছে আমাদেরই। জুন সংখ্যার পরিবর্তে জুলাই সংখ্যা পড়তে হবে।

গল্প নকল

জুলাই সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় শিবানন্দ পালের লেখা 'সতু সেনের কুঠিবাড়ি' গল্পটি পড়লাম। গল্পের প্রথম দিকে লেখক হয়তো নিজের কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু গল্পের পরবর্তী ঘটনা এবং ক্লাইম্যাক্স প্রেমেন্দ্র মিত্রর লেখা 'ভূত যদি ভক্ত হয়' গল্পের প্রায় নকল। গল্পটি 'ভূত যদি বোকা হয়' নামে একটি গল্প সংকলনে রয়েছে। গল্পটিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রর লেখা বেশ কয়েকটি লাইনও সরাসরি তুলে দেওয়া হয়েছে।

পূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গবেষক, স্কুল অফ এনার্জি স্টাডিজ়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০৩২

জুলাই সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় শিবানন্দ পালের লেখা 'সতু সেনের কুঠিবাড়ি' গল্পটির সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রর একটি গল্পের অনেক মিল আছে। 'ঘনাদা' ছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্রর লেখা 'মেজোকর্তা' একটি অনবদ্য চরিত্র, এই মেজোকর্তার ভূত শিকারের নেশা ছিল। 'ভূত যদি বোকা হয়' গল্প সংকলনের প্রথম গল্পের নাম 'ভূত যদি ভক্ত হয়'। এই গল্পটির সঙ্গে 'সতু সেনের কুঠিবাড়ি' গল্পের মিল রয়েছে।

ডঃ তমাল সেনগুপ্ত

কলকাতা (ই-মেল-এর মাধ্যমে)

সম্পাদকীয় উত্তর: শিবানন্দ পালের লেখা 'সতু সেনের কুঠিবাড়ি' গল্পটি সম্পর্কে পূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তমাল সেনগুপ্তর বক্তব্য ঠিক। লেখকের এই কাজ সত্যিই নিন্দনীয়। এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

কমিক্‌স চাই

'আনন্দমেলা' পড়তে দারুণ লাগে, আমার প্রিয় পত্রিকা আনন্দমেলা। তবে অনেক দিন ধরেই আনন্দমেলায় অরণ্যদেব কমিক্‌স, টিনটিন, আর্চিকে খুব মিস করি। গাবলু কমিক্‌সও হারিয়ে গিয়েছে আনন্দমেলা থেকে। এই বিভাগগুলো আবার ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানাই।

আত্রেয় চক্রবর্তী

ঢাকুরিয়া, কলকাতা (ই-মেল-এর মাধ্যমে)

বিশ্বকাপ গাইড 'আনন্দমেলা'

'আনন্দমেলা'র জুন সংখ্যায় বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার সময়সূচি দেওয়ায় খেলা দেখতে আমাদের ভীষণ সুবিধে হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ৩২ টি দেশের নাম এবং কোচের নামও জানতে পেরেছি আনন্দমেলা পড়ে। শুধু তাই নয়, ওই সব দেশের জাতীয় পতাকাও চিনতে পারলাম আমাদের প্রিয় আনন্দমেলা পড়েই। ফুটবল নিয়ে লেখা গল্প দু'টিও ভাল লেগেছে।

বঙ্কিমপ্রসাদ ঘোষ *অষ্টম শ্রেণি,*
রাজনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মালদা

ফুটবল নিয়ে গল্প দারুণ

আমি 'আনন্দমেলা' নিয়মিত পড়ি। জুন সংখ্যায় ফুটবলের গল্প দু'টি ভাল লেগেছে। এই ধরনের গল্প আরও চাই। এ ছাড়াও ভাল লেগেছে বিশ্বকাপের ৩২ টি দেশের পরিচিতি।

তুষার মুর্মু *ষষ্ঠ শ্রেণি,*
চন্দ্রী চন্দ্রশেখর হাই স্কুল ,পশ্চিম মেদিনীপুর

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পার 'ই-মেল'-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

জবাব নেই বিশ্বকাপ সংখ্যার

জুলাই সংখ্যায় বিশ্বকাপ নিয়ে সন্দীপ দাশগুপ্ত, রূপায়ণ ভট্টাচার্য এবং রূপক সাহার লেখা শুধু আমার নয়, আমাদের বাড়ির সকলেরই ভাল লেগেছে। তবে 'রাপ্পা রায়ের কাণ্ড'-এর শেষ কিস্তি একেবারেই ভাল লাগল না। শেষ পর্ব আরও মজাদার হলে ভাল লাগত।

অভিষেক সিংহ *সপ্তম শ্রেণি,*
ঝাড়গ্রাম অশোক বিদ্যামন্দির, পশ্চিম মেদিনীপুর

হাসির গল্প চাই

জুন সংখ্যায় ফুটবল নিয়ে দু'টি গল্পই ভাল লেগেছে। কয়েক মাস ধরেই দেখছি যে, 'আনন্দমেলা'য় হাসির গল্প প্রায় ছাপাই হচ্ছে না। আমি চাই আনন্দমেলায় আরও বেশি করে হাসির গল্প ছাপা হোক। কয়েক বছর আগে আনন্দমেলায় 'মাধ্যমিকের লেখাপড়া' বিভাগটি ছিল। আমার অনুরোধ, এই বিভাগটি পুনরায় চালু করা হোক।

প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

নবম শ্রেণি, মাকড়দহ গার্লস হাই স্কুল

প্রতিদিন এক ঘন্টাই যথেষ্ট। 6 লাখেরও বেশি মানুষ লাভবান হয়েছেন। আর আপনি ?

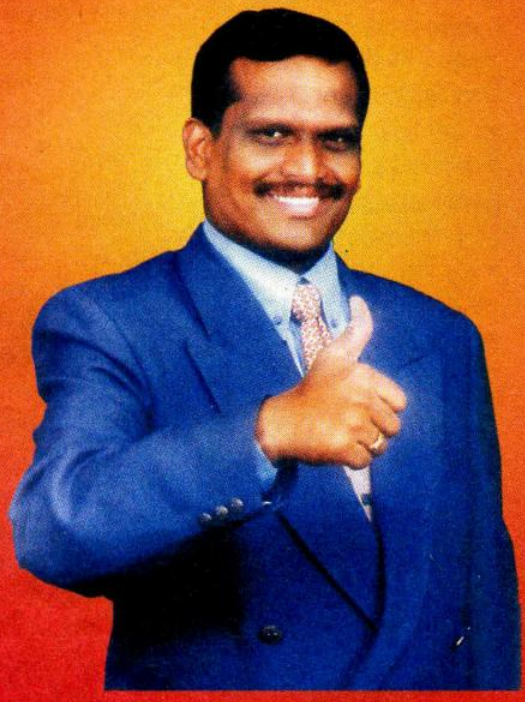

শুধু বাংলা জানলেই চলবে

ইংরেজি

শিখুন

সহজেই ইংরেজি বলুন

K.V.R. B.Com.,B.L., (Director)

আপনি আপনার ঘরে বসে অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই প্রতিদিন ১ ঘন্টা নিজে নিজে শিখলেই যথেষ্ট। আপনি সহজেই ইংরেজি শিখে নিতে পারবেন। আমাদের কোর্স বিশেষরূপে সোজা উদাহরণ সহযোগে সহজ ভাবে তৈরি। এই জন্য নিঃসন্দেহে আপনি ইংরেজিতে সহজেই কথা বলতে পারবেন। এই কোর্সের বর্তমান খরচ **500** টাকা। নীচের কুপন পূরণ করে আমাদের কাছে পাঠান। আপনার পোস্টম্যানের কাছে টাকা দিয়ে কোর্স নিয়ে নিন। এর পরে আর একটি কোর্স আছে যা চার মাসের কোর্স। এর খরচ অনেক কম, নামমাত্র। ইচ্ছে হলে এই কোর্স নিতে পারেন তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।

বিনামূল্যে
১০০ টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স
(সহজ ইংরেজিতে)

6 লাখেরও বেশি মানুষের শেখা ইংরেজি কোর্স।

এক দিনের ইংরেজি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছেন কে.ভি.আর. (পুরস্কারবিজয়ী)

এই কুপন পূরণ করে পাঠান

3807

SINCE 1990

KVR INSTITUTE
AWARD WINNER

বিনামূল্যে
১০০ টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স (সহজ ইংরেজিতে)

New No.203(BEN), Habibullah Road, T.Nagar, Chennai - 600 017.

আমাকে কে.ভি.আর. (**1** মাসের) ইংরেজি কোর্স এবং মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স ইত্যাদি ডাকে পাঠান। আমি পোস্টম্যানকে **500/-** টাকা দিয়ে দ্রুত বই সংগ্রহ করে নেব।

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানা বড় হাতের ইংরেজি হরফে লিখুন।

Name: ....

Address: ....

....

.... Pin Code: [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

* SERVICE TAX INCLUDED

'বাবা যেদিন চশমা হারালেন' প্রতিযোগিতার ফলাফল।

পাঠকের পাতা

এবারের প্রতিযোগিতা

পুজোয় বেড়ানো নিয়ে কবিতা লিখে পাঠাতে হবে। আমরা কবিতার চারটি লাইন লিখে দিলাম—'ছোট মাসি থাকে নেপচুনে আর/মেজোমামা মঙ্গলে/এবার পুজোয় স্পেসশিপে চড়ে/সেইখানে যাব চলে।' এই কবিতার পরের আট লাইন লিখে পাঠাও। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো, তারাই শুধু কবিতাটি লিখে পাঠাবে ২০ অগস্ট তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে কবিতাটি প্রত্যয়িত করিয়ে দিও। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজি ঠিকানা: **পাঠকের পাতা আনন্দমেলা ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১**

১

আমার চশমাটা কোথায় গেল! উঃ এই একটু আগে তো টেবিলের উপর রেখেছিলাম। ওগো, তুমি কি চশমাটা নিয়েছ? বড়খোকা, তুই কি চশমা নিয়েছিস? ছোটখোকা, তোকে একটু আগে চশমায় হাত দিতে দেখলুম। তোমরা কি কেউ জানো না, চশমাটা কোথায় গেল? কাজের সময় যদি একটা জিনিস না পাওয়া যায়! কেউ যখন নাওনি, তখন নিশ্চয়ই চশমার ডানা, হাত-পা গজিয়েছে। তা না হলে যাবে কোথায়! ও হো হো, এই তো আমার পকেটে। নিশ্চয়ই আমার দাদুভাই পকেটে ঢুকিয়েছে!

ভাস্কর হালদার
চতুর্থ শ্রেণি
নালন্দা নার্সারি ও কে জি স্কুল, করঞ্জলি
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

২

আমার খামখেয়ালি বাবার চশমা হারানো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মনে আছে, একবার বাবা তাঁর অত্যন্ত দরকারি, কাজের চশমা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমি তাতে সকলের প্রথম সন্দেহের পাত্রী হয়েছিলাম। চশমাটা পাওয়াও গিয়েছে আমাকে জেরা করেই। তা সেদিন প্রচণ্ড হাঁকডাক। বাইরে এসে জানলাম এবং স্বভাবতই সকলের রোষ এসে পড়ল আমার উপর। ড্রেসিংটেবিল থেকে জুতোর ভিতর, রান্নাঘর, পড়ারঘর, জামাপ্যান্ট, বাদ গেল না কিছুই। ছোটখাটো একটা সাইক্লোন আমাদের ঘরের উপর দিয়ে বয়ে গেল। হঠাৎই চশমাটি আবিষ্কৃত হল। কোথায়? বাবার চোখ থেকে!

শাওনা দাস
সপ্তম শ্রেণি
মাখলা দেবীশ্বরী বিদ্যানিকেতন (ফর গার্লস)
হুগলি

৩

বাবা যেদিন চশমা হারালেন বাড়িতে, সেদিন এক হুলুস্থুলু কাণ্ড বেধে গেল। বাবা আবার চশমা ছাড়া 'রাম'কে বলেন 'শ্যাম' আর 'শ্যাম'কে বলেন 'যদু'। শুরু হল বাড়িময় তল্লাশি। স্নানঘর থেকে চিলেঘর, রান্নাঘর থেকে ঠাকুরঘর। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে খবর পাঠাবার শলাপরামর্শ চলছে। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিতে। দেখলাম কেষ্টঠাকুর দিব্যি চশমা পরে মৃদুমন্দ হাসছেন। কিন্তু চশমাটা এইভাবে কে রাখল? অনেক কালঘাম ঝরানোর পর জানা গেল, এটা আমার আদরের বোনের কাজ। তিনি আবার কারণ দেখালেন, "ঠাকুরমা রোজ বলেন, 'হে ভগবান, সংসারের দিকে একটু ভাল করে নজর দাও।' ভাবলাম, ভগবানের বুঝি দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে, তাই...।"

অর্চিতা মণ্ডল
অষ্টম শ্রেণি
যাদবপুর বিদ্যাপীঠ
কলকাতা-৭০০ ০৩২

টি ভি

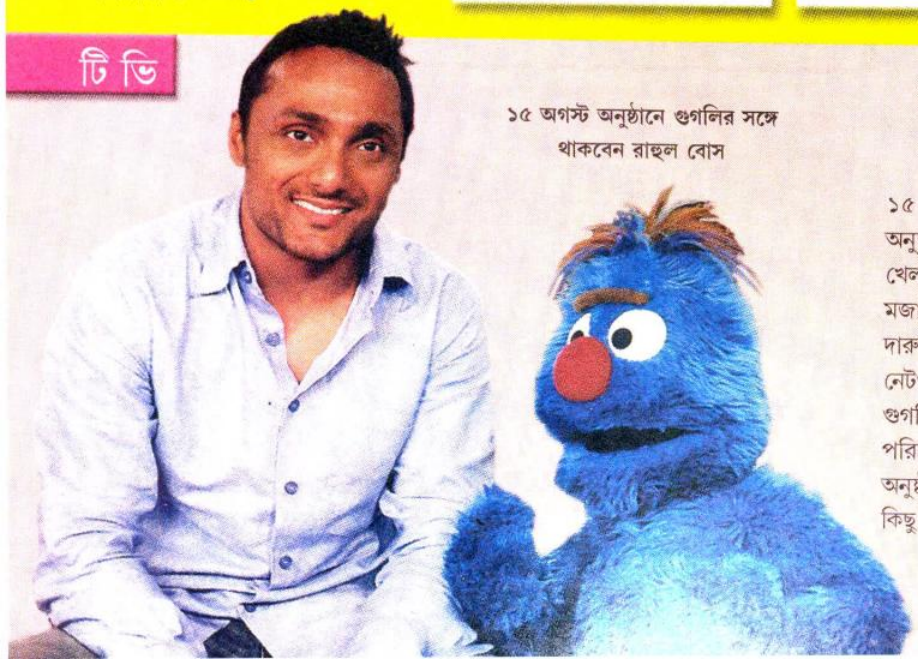

১৫ অগস্ট অনুষ্ঠানে গুগলির সঙ্গে থাকবেন রাহুল বোস

গলি গলি সিম সিম

১৫ অগস্ট মানেই সকাল-সকাল স্কুলে যাওয়া, নানারকম অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া। ফিরে এসে বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে খেলা আর বিকেলে বেড়াতে যাওয়া। দারুণ মজা! তবে এবার মজা হবে আরও বেশি। কারণ, ছোটদের জন্য আছে এক দারুণ খবর। এই দিনই ছোটদের মন কেড়ে নিতে কার্টুন নেটওয়ার্কে শুরু হচ্ছে 'গলি গলি সিম সিম'। চমকি, আঁচু, গুগলি আর বুম্বা, এই চারজনকে দেখা যাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে। সঙ্গে থাকবেন একজন সেলিব্রিটিও। এই অনুষ্ঠান নানা মজাদার জিনিসের মধ্যে দিয়ে ছোটদের অনেক কিছু শিখিয়েও দেবে।

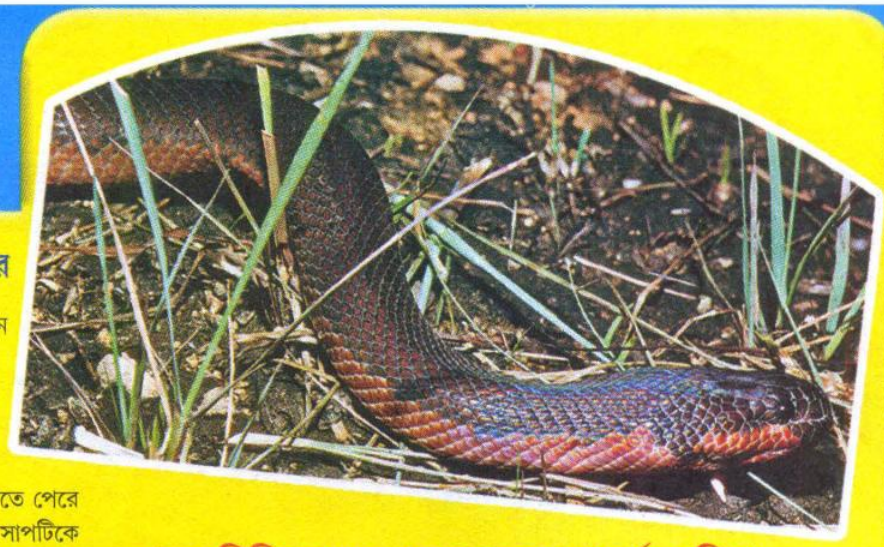

খোঁজ পাওয়া গেল বহুরূপী সাপের

ইন্দোনেশিয়ার বোর্নিওর জঙ্গলে জীববিজ্ঞানীরা সন্ধান পেয়েছেন আশ্চর্য এক সাপের। পৃথিবীতে এরকম সাপের অস্তিত্ব আছে বলে এতদিন জানতেন না তাঁরা। প্রায় আধ মিটার লম্বা এই সাপটি আসলে বহুরূপী, মানে যখন-তখন রং বদলাতে পারে। সাপদের মধ্যেও যে বহুরূপী থাকতে পারে, তা জানতে পেরে স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি সরীসৃপ-বিশেষজ্ঞরা। এই সাপটিকে যখন ধরা হয়, তখন এর রং ছিল লালচে-বাদামি। একটা বালতির মধ্যে একে রেখে দেওয়া হয়েছিল। একটু পরে যখন বালতির ঢাকনা খুললেন তাঁরা, অবাক হয়ে দেখলেন, ততক্ষণে গায়ের রং পালটে ফেলেছে এই সাপটি। বেমালুম সাদা রঙের হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় লোকরা এই সাপকে বলে 'মাড স্নেক'।

রোবট এবার রিকশা চালাবে

রোবটরা তো এখন সব কাজই করছে। ফুটবল খেলা থেকে শুরু করে নার্সিং, কী না করছে হিউম্যানয়েডরা! রোবট যদি রিকশা টেনে নিয়ে যায় তাতেই বা খারাপ কী! চিনের রোবট-বিশেষজ্ঞ ইউ ইউলুর তৈরি রোবট এই কাজে ওস্তাদ। রোবটটি ইউলুর খুবই আদরের। গত ২৬ বছরে ২৫টি যন্ত্রমানব তৈরি করেছে ইউলু। কিন্তু ইউলুর এই সাধের যন্ত্রমানবটিকে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। কারণ, দেনা শোধ করতে হবে যে তাঁকে!

রাতে নিশ্চিন্ত ঘুম এনে দেবে আশ্চর্য বালিশ

রাতে ভাল ঘুম হচ্ছে না? মাঝে-মাঝেই কাটাতে হচ্ছে বিনিদ্র রজনী? ঘুম নিয়ে যাবতীয় সমস্যা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে জাপানের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন এক আশ্চর্য বালিশ, নাম 'স্লিপ ডক্টর'। প্রতিটি রাতের ঘুমকে গভীর আর নিশ্চিন্ত করবে এই বালিশ। বালিশটি ফোমের তৈরি। এতে লাগানো রয়েছে সেন্সর। একজন মানুষের সারারাতের ঘুমের মধ্যে কত শতাংশ খুব গভীর ঘুম, তা মাপবে এই যন্ত্র। তারপর দরকারি পরামর্শ ফুটে উঠবে স্লিপ ডক্টরের পরদায়। টানা কয়েকটা রাত যদি ঘুম না হয় তা হলে বালিশ বলবে, 'টেক ইট ইজি। ভাল করে স্নান করে ফেলুন।' কোনও রাতে হয়তো ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হয়নি। একটানা ঘুমের পর সকালে বালিশ বলবে, 'খুব ভাল, এইভাবে চালিয়ে যান।' এই রকম চল্লিশটি পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা আছে বালিশটির। একজন মানুষের টানা দু' সপ্তাহ ঘুমের হিসেবনিকেশ করবে এই বালিশ। সেই হিসেব দেখে বোঝা যাবে মানুষটির ঘুম ঠিকমতো হচ্ছে কি না! তারপর উপযুক্ত পরামর্শ দেবে স্লিপ ডক্টর। সঙ্গের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, স্লিপ ডক্টরে মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন জাপানের পিলো নির্মাতা 'লফটি' সংস্থার একজন কর্মী।

মনের ভাষা পড়ে দেবে কম্পিউটার

মানুষের মনের অন্দরমহলে এবার ঢুকে পড়তে চলেছে কম্পিউটার। ব্রিটিশ এবং মার্কিন গবেষকরা তৈরি করছেন এমন এক কম্পিউটার, যা কিনা পড়ে ফেলবে মানুষের মনের ভাষা। একজন মানুষের মুখের অভিব্যক্তি, ভ্রূর ওঠানামা, মাথা নাড়া ইত্যাদি দেখে ওই কম্পিউটার জেনে যাবে, কী ভাবছে ওই মানুষটি! ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর পিটার রবিনসন ও তাঁর সহকর্মীদের আশা, এই মাইন্ড রিডিং কম্পিউটারের যথার্থ ব্যবহার মানুষের কাজের নৈপুণ্য বাড়াবে। খুব শিগগিরই বাজারে আসবে এই কম্পিউটার।

জয় সেনগুপ্ত

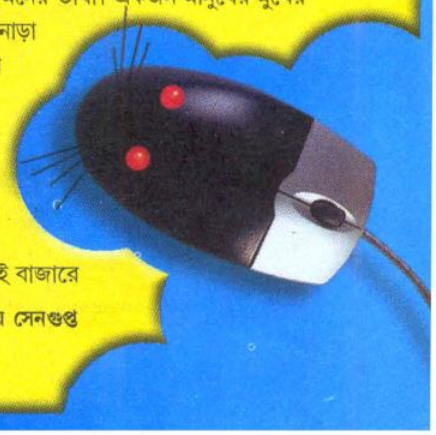

আনন্দমেলার গল্প

প্রিয়জনকে আনন্দ উপহার
গিফ্‌ট কুপন

১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকা মূল্যের এই কুপনের বিনিময়ে পাওয়া যাবে পছন্দের বই।

কুপন কেনার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বই সংগ্রহ করতে হবে।

গিফট কুপন পাওয়া যাচ্ছে ৬৭এ, মহাত্মা গাঁধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০২৯-এ অবস্থিত আমাদের বিপণন কেন্দ্র থেকে।

আনন্দমেলা গল্পসংকলন

সম্পাদনা: পৌলোমী সেনগুপ্ত

২৫০.০০

আনন্দমেলা পত্রিকা আর বাঙালির শৈশব প্রায় সমার্থক। বলা যেতে পারে, গত ৩১ বছর ধরে বাঙালি ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার সঙ্গী আনন্দমেলা। রোজকার জীবন থেকে মনের গাড়িতে পালিয়ে বেড়ানোর সঙ্গী যেমন হতে পারে আনন্দমেলা, তেমনই বাস্তবকে সঠিক আলোয় বুঝতে পারার পথও দেখাতে পারে। আনন্দমেলা সাধারণ সংখ্যার প্রথম ২৬ বছরের (১৯৭৫ থেকে ২০০০) প্রকাশিত গল্পের ভাণ্ডার থেকে বেছে নেওয়া ৫০টি গল্প নিয়ে এই আনন্দমেলা গল্পসংকলন।

পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা গল্পসংকলন

সম্পাদনা: পৌলোমী সেনগুপ্ত

৩০০.০০

পুজোর উৎসবে শরতের সোনালি রোদ, শিউলির গন্ধ, দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দ, নতুন জামাকাপড়ের বর্ণসম্ভার, সপরিবার দুর্গাপ্রতিমা আর একটানা ছুটির সঙ্গে মিশে থাকে পুজোর সাহিত্য। শিশু ও কিশোররা সারা বছর যতটা উন্মুখ হয়ে থাকে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠার জন্য, ততটাই আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীর জন্য তাদের প্রতীক্ষা। কেননা পুজোর অবকাশে এই পত্রিকা যে তাদের হাতে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র ধরিয়ে দেয়। এই পূজাবার্ষিকীতে গত ৩০ বছরে প্রকাশিত নামী লেখকদের পঞ্চাশটি মনমাতানো গল্প নিয়ে হাজির এই সংকলন।

দক্ষিণ কলকাতায় আনন্দ-র বই

গড়িয়াহাটে রাসবিহারী এভিনিউ-র ওপরে যতীন বাগচী রোড এবং হিন্দুস্থান পার্কের মধ্যবর্তী অঞ্চলে

১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯। ফোন: ২৪৬৪ ৬২১২

ঠিকানায় পাবেন আনন্দ-প্রকাশিত সমস্ত বই। নিজের হাতে দেখে পছন্দ করে বই কেনার সুযোগ।

রবিবারেও খোলা থাকছে।

বইপাড়ায় আমাদের দোকান

নিজের হাতে দেখে, বাছাই করে পছন্দের বই কেনার সুযোগ।

৬৭এ, মহাত্মা গাঁধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

নব 'আনন্দ'-এ সবার নিমন্ত্রণ

ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পাওয়া যাবে।

আনন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭। ফ্যাক্স: ২২১৯ ৩৮৫৬। ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

মহিরামপুর হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক)

(ফলতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)

আমাদের স্কুল

আমাদের স্কুল তৈরি হয় ১৯৫৫ সালের ৪ জানুয়ারি। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রয়াত যতীশচন্দ্র রায় এই স্কুল তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার স্কুলগুলোর মধ্যে আমাদের স্কুলটি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই স্কুলের ছাত্রী হিসেবে গর্ব বোধ করি।

জমজমাট খেলার আসর

প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে আমাদের স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রীই খেলার বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করে। এই দিনটির জন্য আমরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি। পড়াশোনার ফাঁকে খেলাধুলোয় মেতে উঠতে আমাদের ভালই লাগে।

সুযেষ্ণা ভট্টাচার্য (একাদশ শ্রেণি)

দেশনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রতি বছর যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন, প্রজাতন্ত্র দিবস প্রভৃতি পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দেশবরেণ্য নেতাদের স্মৃতির উদ্দেশে তৈরি করা হয় একটি শহিদবেদি। আমরা সবাই সেই বেদিতে মালা দিয়ে দেশনেতাদের উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। এই সব অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গানও গাওয়া হয়।

খিচুড়ি খাওয়ার মজা

সরস্বতী পুজো মানেই আনন্দে ভেসে যাওয়ার দিন, সরস্বতী পুজো মানেই সবাই মিলে খিচুড়ি খাওয়া আর জমাটি মজা। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এই দিন আমাদের সঙ্গে প্রায় সারাক্ষণ থাকেন। পুজোর জোগাড় থেকে শুরু করে খিচুড়ি খাওয়া, সব কিছুই আমরা উপভোগ করি। এক বছরের পুজো শেষ হতে না হতেই আবার আগামী বছরের জন্য দিন গুনতে শুরু করি।

সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য (নবম শ্রেণি)

ঘোষণা

নিজেদের স্কুলকে দেখতে চাও 'আনন্দমেলা'র ক্যাম্পাসের পাতায়? তা হলে ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও আমাদের দপ্তরে, সঙ্গে ভাল রঙিন ফোটো পাঠিও কিন্তু! লেখাটি স্কুলের প্রধানকে দিয়ে প্রত্যয়িত করে নিতে ভুলো না। আমাদের ঠিকানা:

আনন্দমেলা
ক্যাম্পাস বিভাগ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

কুইজ়

সারা বিশ্বেই আজ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে অ্যানিমেশন ফিল্ম। ছোট-বড় সকলেরই মন জয় করেছে। এবারের কুইজ় সেই অ্যানিমেশন ফিল্ম নিয়েই।

১ প্রথম সেই অ্যানিমেশন ছবির নাম কী, যেটি পুরোটাই কম্পিউটারে তৈরি হয়েছিল?

২ অ্যানিমেশন ছবি 'দ্য ইনক্রেডিবল' হিন্দিতে ডাব হয়ে মুক্তি পায় 'হাম হ্যায় লাজবাব নামে'। এই ছবিতে প্রধান চরিত্র বব পার (বা মিস্টার ইনক্রেডিবল)-এর গলাটি কার ছিল?

৩ হারানো ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়েছেন বাবা মার্লিন। কোন বিখ্যাত অ্যানিমেশন ছবির গল্প এই ঘটনাকে ঘিরে?

৪ এই ছবির প্রধান তিন চরিত্রের নাম ম্যানফ্রেড, সিড এবং দিয়েগো। ছবিটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল 'দ্য কুলেস্ট ইভেন্ট ইন সিক্সটিন থাউজ্যান্ড ইয়ারস'। কোন ছবি?

৫ 'দ্য লায়ন কিং' ছবির দৌলতে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল সোয়াহিলি ভাষার 'হাকুনা মাতাতা' শব্দটি। এর অর্থ কী?

৬ কোন ছবির ট্যাগলাইন ছিল 'দ্য গ্রেটেস্ট ফেয়ারি টেল নেভার টোল্ড'?

৭ 'আলাদিন' ছবিতে 'জেনি' চরিত্রটির গলার আওয়াজ ছিল হলিউডের এক খ্যাতনামা অভিনেতার। তাঁর নাম কী?

৮ ২০০২ সাল থেকে 'সেরা অ্যানিমেশন ফিচার ছবি'র পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম কোন ছবি এই বিভাগে অস্কার পেয়েছিল?

অভিজিৎ সুকুল
তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

গত সংখ্যার উত্তর

১. জো শাস্টার।
২. ক্রিপটন।
৩. ক্লার্ক জোসেফ কেন্ট।
৪. রবার্ট রেডফোর্ড।
৫. ১৯৩৮ সালে।
৬. ডেলি প্ল্যানেট।
৭. ক্রিপটো।
৮. স্মলভিল।

জবাব চাই

১. 'নিষিদ্ধ শহর' কাকে বলা হয়?
২. রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতর কোন শহরে?
৩. ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. নীল, হলুদ ও লাল। ২. মোনালিসা। ৩. ব্র্যান্ডন রুথ।

সঠিক উত্তরদাতা

জ্যোতির্ময় শীল, নবম শ্রেণি, রাজবলহাট উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলি; **সম্পদ ঘোষ,** পঞ্চম শ্রেণি, বাঁশবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলি; **অরুণিমা দত্ত,** সপ্তম শ্রেণি, রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, কান্দি, মুর্শিদাবাদ; **মণিদীপা ঘোষ,** আরামবাগ গার্লস স্কুল, হুগলি; **অলি চক্রবর্তী,** সপ্তম শ্রেণি, সারদা বিদ্যাপীঠ, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা;

স্নেহাশিস সোম, দ্বাদশ শ্রেণি, মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা; **অর্ণা চট্টোপাধ্যায়,** নবম শ্রেণি, সেন্ট অ্যাগনেস কনভেন্ট স্কুল, হাওড়া; **আবেশ দেব; সৌরভ খাঁ, সূর্যাশিস পাত্র, আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়,** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **অনন্যা রায়চৌধুরী,** অষ্টম শ্রেণি, গঙ্গারামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর; **দেবজ্যোতি ঘোষ,** নবম শ্রেণি, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইনস্টিটিউশন, কলকাতা; **সাহিনা নাসরিন,** একাদশ শ্রেণি, শিবপুর হিন্দু গার্লস হাই স্কুল, হাওড়া; **শুভ্র চট্টোপাধ্যায়,** অষ্টম শ্রেণি, লিসে, কলকাতা; **শুভজিৎ রায়,** ক্যালকাটা পাবলিক স্কুল, কালিকাপুর, কলকাতা; ই-মেলে যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছে: **সুজন শিকদার,** ষষ্ঠ শ্রেণি, শিলিগুড়ি বয়েজ় হাই স্কুল, দার্জিলিং; **রক্তিম পোদ্দার,** অষ্টম শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, দুর্গাপুর, বর্ধমান; **কার্তিক চট্টোপাধ্যায়,** সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল, কলকাতা; **মোহিনী ঘোষ,** পঞ্চম শ্রেণি, যোগেশচন্দ্র গার্লস হাই স্কুল, হাওড়া; **রাকেশ মালিক,** দশম শ্রেণি, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া; **অনিন্দ্য বর্মন,** দ্বাদশ শ্রেণি, দ্য অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ স্কুল, কলকাতা; **গৌরব সাহা,** সপ্তম শ্রেণি, কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ইংরেজি বিভাগ), চন্দননগর, হুগলি।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

গুপিচোরের কাণ্ড

সাথী সেনগুপ্ত

জীবনের উপর হতচ্ছেদ্দা এসে যায় গুপির। তিন দিন ধরে টানা বৃষ্টি পড়ছে। উঠোনে গোড়ালি-ডোবা জল। ঘরের মেঝেতেও কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। চালের ফুটো দিয়েও জল গড়িয়ে বিছানা ভিজছে। গুপির বউ বিছানাটা এদিক সরায় তো ওদিক সরায়। ছেলেটার সর্দি-কাশি। সব মিলিয়ে অসহ্য অবস্থা। তার উপর এক পয়সা রোজগার নেই। মাস দেড়েক আগে, কাজে বেরিয়ে পায়ের উপর মণ্ডলদের পাঁচিলের খানিকটা ধসে পড়ল। ব্যস, থ্যাতলানো পা নিয়ে ঘরবন্দি। কে জানে, হাড়গোড় ভেঙেছে কি না! গাঁ ঘরে কে আর ডাক্তার দেখিয়ে, হাড়ের ছবি তুলিয়ে চিকিচ্ছে করায়? সারলে অমনিই সারবে। বউ অবশ্য লতাপাতা, চুন-হলুদ, এটা ওটা টোটকা দিয়ে পা-টা বেঁধে দিয়েছিল। তাতে যা হয়। মুশকিল হল, তারপর থেকে গুপি আর দৌড়তে পারে না। খানিকটা লেংচে-লেংচে হাঁটে। আর গুপিদের যখন-তখন দৌড়ে পালাতে হয়। নইলে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। আর ধরা পড়লে শুধু গুপিই ঝামেলায় পড়বে না, দলসুদ্ধ লোকের নানা হেনস্থা। তাই তো ওস্তাদ আজকাল গুপির কাজকর্ম নিয়ে বিশেষ গা করছে না। বরং বলল, "তুই ক'দিনের জন্যি বসে যা গুপে। টাকাপয়সা যা দরকার দিয়ে দেব।"

বলছে বটে, কিন্তু দিচ্ছে কি? তিনবার গিয়ে ঘ্যানর-ঘ্যানর করলে একবার হয়তো কিছু দেয়। তাতে আর যাই হোক, সংসার চলে না। গুপির বউ তিন বেলা কথা শোনাচ্ছে। এই তো সেদিন বিয়ের সময়কার কানের মাকড়ি জোড়া বাঁধা দিয়ে এসে আপন মনে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগল, "কী ভাগ্যিই যে করেছিলুম। ঘরের মানুষ বসে খাচ্ছে, আর মেয়েমানুষের কানের সোনাটুকুও বাঁধা দিতে হল। তাও তো বাবা দিয়েছিলেন, তাই রক্ষে।"

আগে হলে গুপি মটমটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাত পোহানোর মধ্যে তিন জোড়া কানের গয়না এনে মুখের উপর ছুড়ে দিয়ে বলতে পারত, "নে, কত গয়না পরবি পর।"

তা সময় খারাপ, তাই আর কী করা যাবে। ওই যে কথায় আছে না, 'হাতি যখন দ'য়ে পড়ে, চামচিকেতে নাথি মারে।' হুঃ, নইলে সেদিনের ছোকরা পানু, গুপি, যাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে, সে কিনা বলল, "গুপিদা, তুমি বরং এ-কাজ ছেড়ে দাও। এর চেয়ে গঞ্জের বাজারে গিয়ে বিড়ি বাঁধো। পাঁচটা লোক তোমার কাছে আসবে-যাবে। তুমি বরং ওস্তাদকে সুলুকসন্ধান দিতে পারবে।

ওস্তাদও তো সেকথাই বলছিল।"

শুনে গুপির রাগে গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল। ওস্তাদও একথা বলেছে, তা বিশ্বাস হতে চায় না গুপির। আরে শুধু ছুটতে পারলেই কি এই লাইনে কাজ করা যায়? গুপির যা বিদ্যে জমা আছে, তাতে ইচ্ছে করলে ওস্তাদকেও শেখাতে পারে। গুপির শিক্ষা কী এসব এলেবেলে ছিঁচকে ওস্তাদের কাছে? গুপির গুরু জগা ওস্তাদ যে সে লোক নয়। আজও তার নামে পাঁচটা গাঁয়ের লোকে মান্যি করে। তার যা বিদ্যে জানা ছিল, সেসব জানতে বাঘা-বাঘা ডাকাত দলের সর্দার অবধি তার কাছে হত্যে দিত। মন্তরই জানত কত রকমের। নিদালি মন্তর, অপদেবতার মন্তর, অবশ মন্তর, সিঁধকাঠির মন্তর, এমনই কত কী। গুপির মতো চুনোপুঁটি অতশত না জানলেও সৎসঙ্গে স্বর্গবাস হেতু কিছু বিদ্যে শিখেছিল। তাতেই তো এত কাল করে খাচ্ছে। তবে আজকাল সব কাজেই লোক বেড়ে যাওয়ায় ক'বছর হল গুপি কালু ওস্তাদের ডেরায় নাম লিখিয়েছে। তাতে সময়ে-অসময়ে কিছু সুবিধেও হয়।

যাক্‌গে, এভাবে আর বসে থাকা যায় না। লোকজনের এত অচ্ছেদ্দা, দয়া, ঘেন্না সহ্যিও করা যায় না। যা হয় হোক, গুপি আজ বেরোবেই। সন্ধের পর গুপিকে বসে তেল মাখতে দেখে, গুপির বউ ভুরু কুঁচকেছিল, "অ্যাদ্দিন পরে আবার যে পুরনো নিয়ম দেখি?" তবে বিশেষ কিছু বলেনি। চৌকির তলা থেকে খুঁজে পেতে যন্তরটা বের করেও দিয়েছিল। গুপিও কথা বাড়ায়নি। গুরুদেবের নাম করে সিঁধকাঠিটা কপালে ঠেকিয়ে পথে বেরিয়েছিল। সকালবেলায় পান্তির মায়ের কাছ থেকে একটা খবর পেয়েছিল। সেটাই যাচাই করে দেখা যাক।

॥ ২ ॥

সাঁপুইবাড়িতে খুব রাঁধাবাড়ার ধুম লেগেছে। সাঁপুইবাড়ির মেজোকর্তার বড় মেয়ের জামাই এসেছে কলকাতা থেকে। সন্ধের গাড়িতে এসে পৌঁছেছে। মেয়েটা বেশ ক'দিন বাপের বাড়ি ছিল। কালই ভোর-ভোর মেয়েকে নিয়ে জামাই চলে যাবে। তাই রাত্তিরেই রাঁধাবাড়ার বিশাল আয়োজন। বড়কর্তা সকালেই পুকুরে জাল ফেলিয়েছেন। বড়-বড় মাছ উঠেছে। বাড়িতেই নধর কচি পাঁঠা কাটিয়ে মাংসের জোগাড় হয়েছে। অন্যান্য রান্নাবান্না তো আছেই। বাড়িতে বেশ লোক গমগম করছে। গুপি একবার ভাবল, এত লোকের মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা যাবে কি না। তবে রান্নাঘরটা ভিতরবাড়ির পিছন দিকে। আর রান্নাঘরের পিছনটা বেশ গাছপালা, ঝোপঝাড় মতো। ওখানটায় চুপচাপ লুকিয়ে থাকা যায়। এই বৃষ্টির রাত্তিরে ওখানে আশা করি কেউ যাবে না। ওখানেই চুপ করে বসে গুপি। ছাঁচতলায় বসে থাকায় মাথাটা বাঁচলেও, গায়ে বৃষ্টির ছাঁট যথেষ্টই লাগছিল। এভাবে কাকভিজে হয়ে কতক্ষণ বসতে হবে কে জানে!

বেড়ার ফুটো দিয়ে ভিতরের কাজকর্ম সবই দেখতে পাচ্ছে গুপি। মেয়েরাই সব জটলা পাকিয়েছে। তাদের কথাবার্তাও কানে আসছে গুপির। মশার কামড়ে পা ফুলে ঢোল হলেও গুপি একচুলও নড়ছে না। এ অভ্যেস ওদের লাইনে সকলেরই আছে। তবে রাত্তিরে 'যাদের নাম করতে নেই' তাদের ঠেকাবার মন্তর গুপি শিখেছিল তার গুরুর কাছ থেকে। ফলে ঘণ্টার পর-ঘণ্টা ঝোপেঝাড়ে বসে থাকলেও, গুপি তাদের ভয় পায় না।

বড়-বড় কাঁসা পেতলের বাসন নেমেছে। জামাইয়ের থালা-বাটিগুলো বোধ হয় রুপোর। এই ক'খানা বাসন সরাতে পারলেই কেল্লা ফতে। এই অঞ্চলে সাঁপুইদের বিস্তর ধানজমি থাকায় টাকাপয়সা যথেষ্ট। এই তো মেয়ের বিয়েতে এমন ঘটা করল যে, গাঁসুদ্ধ লোকের তাক লেগে গেল।

সে যাই হোক, গুপি বেড়ার ফুটো থেকে নজর সরায় না। রান্নাবান্নার পাট বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে। মাঝখানের চারচালা ঘরের মেঝেতেই বোধ হয় খাবার আসন পড়েছে। থালা-বাসনের ঝনঝন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। রান্নাঘরে মেয়েমহলেও বেশ হুড়োহুড়ি ব্যস্ততা। ছুটোছুটির মধ্যে জামাইকে নিয়ে হাসি মশকরাও চলছে। বড়গিন্নি মোটাসোটা, ভারিক্কি চেহারার মানুষ। বেশি ছুটোছুটি করতে পারেন না। তবে সংসারের দেখাশোনা তিনিই করেন। সকলকে ডেকেহেঁকে তিনিই অন্যদের কাজ ভাগ করে দিলেন। এবারে জামাই খেতে বসবে, সঙ্গে বাড়ির কর্তারা এবং ছেলেরা। বড়গিন্নি পরিবেশন করবেন। অন্যরা হাতে-হাতে জোগান দেবে।

খাবারদাবারের গন্ধে খিদেও পেয়ে যায়। ইস, সকলে মিলে আজ কী চর্ব্যচোষ্যই খাবে। গুপির ইদানীং জুটছে শুধু ভাতে-ভাত। তাও ভরপেট নয়। এক-একবার মনে হচ্ছে, ধুত্তেরি, কাজের নিকুচি করেছে। তার চেয়ে একপেট গান্ডেপিন্ডে গিলে মুখ মুছে বাড়ি গেলেও মন্দ হত না। সঙ্গে-সঙ্গে মনে-মনে কান মলে জিভ কাটে গুপি। ছি-ছি, কাজে নেমে অন্য কথা চিন্তা করাও মহাপাপ।

জামাইয়ের খাওয়া দেখতে মেয়ে-বউরা সব মাঝের ঘরে গিয়েছে। রান্নাঘর প্রায় ফাঁকা। শুধু বড়কর্তার ছোট ছেলের বউটা ঘরের কোণে বসে ঢুলছে। বেচারা, বয়স তো বেশি নয়, সারাদিন খেটেখুটে ঘুম পেয়ে গিয়েছে। ঘরের মধ্যিখানে হ্যারিকেনটা টিমটিম করছে। রান্নাঘরের ভাঙা বেড়ার দিকটায় সিঁধ খুঁড়তে হবে। এমনিতে বর্ষা-বাদলে মাটি নরম। প্রায় নিঃশব্দেই কাজ সারা যাবে। রান্নাঘরে মেয়ে-বউদের আসা-যাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে কাজ শুরু করে গুপি। পাকা হাতের কাজ। প্রায় নিঃশব্দে কাজ এগোয়। ঘরের কোণের দিকে মাটির তৈরি ঢালা উনুন। তার পিছনেই একটা চৌকো মতো জানলা। জানলা দিয়ে উঁকি না দিয়ে বেড়ার ফুটো দিয়ে গুপি নজর রাখছে। উনুনে নেভা আঁচে কী যেন একটা বসানো রয়েছে।

খানিক পরে দু'জন মহিলা রান্নাঘরে ঢুকল। ঢুকেই ছোটবউকে বকুনি লাগাল, "এই ছুটকি, ওঠ-ওঠ। সন্ধে থেকে এত ঘুম কিসের রে? আমরা দৌড়ে কুল পাচ্ছি না। শোন, খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন শেষ পাতে পায়েস যাবে। তুই চটপট বাটিতে-বাটিতে পায়েস বেড়ে দে। আমরা বরং মাংসটা আর-একবার ঘুরিয়ে আনি।"

মহিলা দু'জন মাংসের হাঁড়ি নিয়ে দুদ্দাড়িয়ে খাবার ঘরে চলে গেল।

ওহো, কড়ায় তা হলে পায়েস বসানো রয়েছে! ইস, কতদিন যে পায়েস চেখে দেখেনি গুপি। খোকাও বোধ হয় কোনও দিনও পায়েস খেয়েই দেখেনি। গুপির বউটা বোধ হয় পায়েস রাঁধতেই জানে না। বউকে অবশ্য দোষ দেয় না। গরিবের মেয়ে, গরিবের ঘরে পড়ে রাঁধাবাড়ার

গল্প

সুযোগই পায়নি কখনও। এরকম ঠান্ডার দিনে গরম-গরম পায়েস খেলে বেশ লাগত কিন্তু। মনে-মনে আবার জিভ কেটে নিজেকে কানমলা দেয় গুপি।

ঘুমের চটকা ভেঙে ছোটবউ পায়েস বাড়তে এল। মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছে না। কোনও মতে বড় কাঠের বারকোশের উপর বাটি সাজায়। লম্বা ডান্ডাওয়ালা গোল মাথা হাতা দিয়ে এবার বাটি ভরবে। ও মা, ঘন সরপড়া পায়েসের উপর লম্বা কালো দড়ির মতো কী পড়ে আছে না! ঘুম-ঘুম চোখে হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় ভাল করে বুঝতেও পারে না ছোটবউ। কে জানে, বোধ হয় ঘরের চাল থেকে পুরনো শিকে ছিঁড়ে দড়িদড়া কিছু পড়েছে। নাকি ঝুলটুল কিছু। ইস, পায়েসটা একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে। পায়েসটা যদি ফেলে দিতে হয়, তবে কী দেবে জামাইয়ের পাতে? ছিঃ ছিঃ, মিষ্টি ছাড়া কী জামাইয়ের খাওয়া হয়! শুধু বাড়ির কেন, গোটা গাঁয়ের যে নিন্দে হবে। এই রাতবিরেতে গজুময়রার দোকানে কিছু কি পাওয়া যাবে! আর সাততাড়াতাড়ি আনবেই বা কে?

নিজের কাজকম্ম ভুলে সাঁপুইবাড়ির মানমর্যাদা নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়ে গুপি। তার পরেই সচেতন হয়ে মনে-মনে নিজের দু' গালে দু' চড় মারে গুপি। ওস্তাদ সব সময় বলত, 'কাজে নেমে অন্যমনস্ক হবি না।' কিন্তু মন ব্যাপারটা অ্যায়সা বেয়াড়া যে, ডাইনে চলতে বললে চলবে বাঁ দিকে।

আরে-আরে, বউটা করে কী? প্রথমে বউটা হাতা নিয়ে পায়েস তুলতে এসে থমকাল। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় ঝুঁকে পড়ে বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারখানা। তার পরেই, ওমা, এ কী কাণ্ড! হাতা দিয়ে পায়েসের কড়াই থেকে কালোমতো দড়িটাকে তুলে ছুড়ে ফেলল জানলা দিয়ে। তারপর কড়াইয়ের অন্য ধার থেকে হাতায় করে পায়েস দিতে লাগল বাটি ভরে-ভরে। এদিকে পায়েসমাখা দড়িগাছাটা ছপটে লাগল গুপির গায়ে। ছ্যাঁক করে উঠল গুপির সারা শরীর। স্বাভাবিক ভাবেই জিনিসটায় হাত রেখেই চমকে উঠল গুপি। কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি বয়ে গেল সারা শরীরে। না না, দড়ি নয়। মনে হচ্ছে কোনও সজীব পদার্থ। রান্নাঘরের বেড়ার ফুটোফাটা দিয়ে যেটুকু আবছা আলো আসছিল, তাতে জিনিসটা নজর করে লাফিয়ে উঠল গুপি, "ওরে সব্বোনাশ! এ যে দেখছি রাত্তিরে নাম করতে নেই!"

খুব বড় নয়, সরু হিলহিলে চেহারা। গরম পায়েসে পড়ে মরে সেদ্ধ হয়ে উঠেছে। এবার কী হবে? এই পায়েস খেলে সঙ্গে-সঙ্গে একবাড়ি লোকের স্বর্গপ্রাপ্তি। বউটা কী অন্ধ না পাগল! দ্যাখো কাণ্ড! দিব্যি বসে-বসে বাটিতে পায়েস ঢালছে। হে ভগবান, গুপি এবার কী করে! ভাঙা বেড়ার গা ঘেঁষে যে গর্তটা করেছে, সেটা ঠেলে উঠে এসে বউটাকে মারবে নাকি ধাক্কা। তার আগেই গুপিকে দেখে বউ অবিশ্যি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখন বাটি ক'টা ঝোলায় পুরে সটকে পড়লেই হয়। কিন্তু কড়ার পায়েসটার কী হবে? সেটাকেও ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু ভাবা আর কাজে করা তো এক কথা নয়। এর মধ্যেই কে একজন ঘরে ঢুকল। মনে হয় বড় তরফের বড়ছেলের বউ। গুপি অবশ্য সেভাবে চেনে না। এসেই সাজানো বাটিসুদ্ধ বারকোশটা নিয়ে গেল খাবার ঘরে।

॥ ৩ ॥

"এই তো পায়েস এসে গিয়েছে। জামাইকে বড় বাটিটা দাও বউমা। আজকালকার ছেলেরা তো মিষ্টি খেতেই চায় না।" বড়সাঁপুই হেঁকে বললেন।

মেজোকর্তা বললেন, "তোমার মনে আছে বড়দা, আমি একবার একাই দু' কিলো দুধের পায়েস সাবড়ে দিয়েছিলাম।"

খেতে-খেতে সকলে মিলে কথাবার্তা, ঠাট্টা-তামাশা করছে। মেয়েরা ঘোমটার আড়ালে মুখ টিপে হাসছে। আর ফিসফিস করে টিপ্পনিও কাটছে। হঠাৎ পুরনো দাসী মোক্ষদা চেঁচিয়ে ওঠে, "এ কী, এ কী, এ আবার কে এল গো!"

মেয়েরা হুড়মুড় করে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। কালোপানা, লেংটি পরা, কাদা মাখা, জলে ভিজে সপসপে হয়ে একটা লোক ঢুকল লেংচে-লেংচে। কর্তারাও ব্যাপার দেখে খাওয়া ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন। লোকটা তখন হাত জোড় করে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "পেন্নাম কর্তাবাবুরা, পেন্নাম হই মা জননীরা, আমার অপরাধ মাজ্জনা করবেন। দয়া করে আপনারা এ পায়েস খাবেন না।"

বড়সাঁপুই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "তুই কে রে, কোত্থেকে এলি? পায়েস খেতে মানাই বা করছিস কেন?"

লোকটা তখন হাতজোড় করে কাতরভাবে বলল, "অধমের নাম গুপিনাথ কর্তা। পরিচয় আর না-ই দিলাম। তবে ও পায়েসে বিষ রয়েছে।"

তখন তুমুল গোলমাল, হইচই শুরু হল। জামাই তো শুনেটুনে চোখ উলটে প্রায় অজ্ঞান।

"ও মা, কী সব্বোনেশে কথা গো!" বলে সুর করে কান্না জুড়ে দিল বাড়ির মহিলারা।

তার মধ্যে মোক্ষদা চেঁচিয়ে বলল, "ও মা ঠাকরুন, এ ব্যাটা তো গুপেচোর গো। ওই দ্যাখো, ওর হাতে সিঁধকাঠি।"

তখন ছেলেরা কেউ-কেউ জুতো খুলে গুপিকে এই মারে তো সেই মারে। বড়কর্তা হাঁক দিয়ে বললেন, "তোমরা সকলে শান্ত হও। আমাকে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিতে দাও। কী হয়েছে সত্যি করে বল তো গুপিনাথ? মিথ্যে বললে কিন্তু আজই তোর শেষ দিন। আর তা ছাড়া এখানে এসেছিলিই বা কেন?"

গুপি কাতরভাবে বলল, "আমি সব সত্যি বলছি গো কর্তা। দরকার হলে পেরমানও দেখাতে পারি।"

কর্তা সব শুনলেন। তারপর বললেন, "চল।" রান্নাঘরের পিছনে পায়েসমাখা মরা সাপটা এখনও ভেজা ঘাসের উপর পড়ে ছিল। কর্তা দেখে আঁতকে উঠলেন।

গুপি তখনও বলতে থাকে, "আমি চুরি করতেই এসেছিলুম কর্তা। আপনি আমায় যা খুশি সাজা দিতি পারেন। কিন্তু এই ঘটনা দেখবার পরও কীভাবে চুপ করে থাকি বলুন?"

কর্তা এবার বললেন, "সে তো ঠিক কথাই। সাজা দেব বলেই তো তুই আমাদের গুষ্টিসুদ্ধর প্রাণ বাঁচিয়েছিস। তার আগে জামাকাপড় ছাড়। গা-হাত-পা ধুয়েমুছে পেট পুরে খেয়ে নে। তারপর ভেবে দেখব, তোর মতো 'সুবুদ্ধি চোর'কে কী সাজা দেওয়া যায়! ওরে কে আছিস, একখানা শুকনো কাপড় নিয়ে আয়।"

ছবি: দেবাশিস দেব

আনন্দ সংবাদ

ABP

Subscription Order

আমরা সানন্দে ঘোষনা করছি **পশ্চিমবঙ্গের বাইরের** সমস্ত পাঠকের জন্য গ্রাহক-চাঁদা প্রকল্প। নিচের পছন্দসই বক্সে (√) চিহ্ন দিন।

ম্যাগাজিন	এক বছরের মূল্য (টাকায়)	দুই বছরের মূল্য (টাকায়)
সানন্দা	☐ ৩৫০	☐ ৬২০
দেশ	☐ ১৭০	☐ ৩৪০
আনন্দলোক	☐ ৩২০	☐ ৫৭৫
উনিশ কুড়ি	☐ ২২০	☐ ৩৭৫
আনন্দমেলা (মাসিক)	☐ ১২০	☐ ২২০
বইয়ের দেশ (ত্রৈমাসিক)	☐ ১০০	☐ ১৯০
সানন্দা + দেশ	☐ ৫০০	☐ ৯২৫
দেশ + আনন্দলোক	☐ ৪৭৫	☐ ৮৭৫
আনন্দলোক + উনিশ কুড়ি	☐ ৫০০	☐ ৮৭৫
সানন্দা + আনন্দলোক	☐ ৬৫০	☐ ১১২৫
দেশ + উনিশ কুড়ি	☐ ৩৫০	☐ ৬৭৫
সানন্দা + উনিশ কুড়ি	☐ ৫৫০	☐ ৯৫০
সানন্দা + আনন্দমেলা	☐ ৪৫০	☐ ৭৭৫
দেশ + আনন্দমেলা	☐ ২৭৫	☐ ৫২৫
উনিশ কুড়ি + আনন্দমেলা	☐ ৩০০	☐ ৫৫০
দেশ + বইয়ের দেশ	☐ ২৬০	☐ ৫০০
সানন্দা + দেশ + আনন্দমেলা	☐ ৫৮০	☐ ১০৫০
সানন্দা + আনন্দলোক + আনন্দমেলা	☐ ৬৮০	☐ ১২০০
সানন্দা + উনিশ কুড়ি + আনন্দমেলা	☐ ৬০০	☐ ১১০০
আনন্দমেলা + দেশ + আনন্দলোক	☐ ৫৫০	☐ ১০০০
আনন্দলোক + উনিশ কুড়ি + আনন্দমেলা	☐ ৫৮০	☐ ১১০০
দেশ + উনিশ কুড়ি + আনন্দমেলা	☐ ৪৫০	☐ ৮৫০
সানন্দা + দেশ + আনন্দলোক	☐ ৭৭৫	☐ ১৪০০
দেশ + আনন্দলোক + উনিশ কুড়ি	☐ ৬৫০	☐ ১১৭৫
সানন্দা + আনন্দলোক + উনিশ কুড়ি	☐ ৮০০	☐ ১৪০০
সানন্দা + দেশ + উনিশ কুড়ি	☐ ৬৭৫	☐ ১২২৫
সানন্দা + আনন্দলোক + দেশ + উনিশ কুড়ি	☐ ৯২৫	☐ ১৬৫০
সানন্দা + আনন্দলোক + দেশ + উনিশ কুড়ি + আনন্দমেলা	☐ ৯৭৫	☐ ১৭০০

I am enclosing my Cheque/DD no_____ dated_____ for Rs_____ on bank_____

branch_____ drawn in favour of **ABP Private Limited.**

Or please charge the total amount of Rs_____ to my credit card [ ] VISA [ ] MasterCard

Card No_____ Cardmember's Name_____

City _____ PIN_____ Phone (STD) _____ Email_____

Card expiry date_____/_____/_____ CVV No _____ (last 3 digits on the signature panel of the card)

Personal details (in bock letters)

Name _____

Address _____

District _____ City _____ PIN (Mandatory) _____

Phone _____ Email _____

Age : ☐ 11-15 ☐ 16-25 ☐ 26-35 ☐ 36-50 ☐ 50+

Education: ☐ Graduate ☐ MBA ☐ CA/CFA ☐ Other_____

Occupation: ☐ Student ☐ Self employed ☐ Business ☐ Service ☐ Other_____

Signature of Subscriber

Current Subscription Code (if applicable)_____

শর্তাবলি

(১) বিশেষ মূল্য ও সুযোগ কেবল ভারতেই বৈধ। (২) আপনার গ্রাহক-চাঁদা প্রসেসিং-এর জন্য আমাদের ৪-৬ সপ্তাহ সময় দিন। এর পরে আপনি আপনার কপি পেতে থাকবেন। (৩) নগদ টাকা পাঠাবেন না। (৪) আপনার চেক বা ডিডি-র উল্টোদিকে আপনার নাম ও ঠিকানা লিখে দেবেন। (৫) এই সুযোগ ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যবসায়িক চ্যানেলের মাধ্যমেও পৃথকভাবে ম্যাগাজিন পাওয়া যাবে। (৬) এবিপি প্রাঃ লিঃ নিজস্ব সিদ্ধান্তে যে **কোনও সময়ে এই** সুযোগ প্রত্যাহার করতে বা তার মেয়াদ বাড়াতে পারে। (৭) এবিপি প্রাঃ লিঃ নিজ সিদ্ধান্তে কোনও গ্রাহক-চাঁদা না নেওয়ার অধিকারও রাখেন। (৮) কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে তা কলকাতা **অধিক্ষেত্র সাপেক্ষ হবে**। (৯) একই ব্যক্তির একাধিক গ্রাহক-চাঁদা অনুমোদিত হবে না। (১০) শর্ত প্রযোজ্য হবে। (১১) গ্রাহক-কপি বুক পোস্টে পাঠানো হবে।

Kolkata : Ashis Dasgupta, 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 001, Phone 22600745, 22600748, Email subscription@abpmail.com • Chennai : Shiv Kumar D, 74 Royapettah High Road, Chennai 600 014, Phone (044) 28131278/79/86, Email shiva@abpmail.com • Delhi : Anirban Bagchi, Express Building, 3rd Floor, 9/10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002, Phone (011) 23702170-79, Email abagchi@abpmail.com • Mumbai : Utpal Chakraborty, B2 Paragon Condominium, Opp. Century Mills, P.B. Marg, Worli, Mumbai 400013, Phone (022) 24962601-08, Fax (022) 24962597, Email uchakraborty@abpmail.com • Bangalore : Shiv Kumar D, 14 Madras Bank Road, 4th Floor, Bangalore 560001, Phone (080) 25588127/5637/8886, Email : shiva@abpmail.com • Hyderabad : Mockbul Hoque, PTI Building, 3rd Floor, A.C. Guards, Hyderabad 500004, Phone (040) 23317147 • Ranchi : Samit De, Gopal Complex, 4th floor, Kacheri Road, Ranchi 834001 Phone (0651) 2315941-42, Fax (0651) 2315943, Email samitde@abpmail.com • Jamshedpur : Samit De, Shantiniketan Building, 2nd floor, Bistupur Main Road, Jamshedpur 831001 Phone (0657) 2425128/129/134, Fax (0657) 2425132 Email samitde@abpmail.com • Bhubaneswar : Somnath Roy Chowdhury, Janapath Tower, Ashoke Nagar, Unit-II, 4th Floor, Room No. 409, Bhubaneswar 751009, Phone (0674) 2532737/741, Fax (0674) 2532739 • Guwahati : Sourav Mohanta, Godrej Building, 3rd Floor, G.S. Road, Ulubari, Guwahati 781007 Phone (0361) 2636848/49, 2636624, 2630327, Fax (0361) 2630327, Email smahanta@abpmail.com

গল্পটা শুধুই শীলার

আবদুল্লাহ-আল-মাসুম

গতবার ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করেছিল শীলা। পড়ালেখায় তার একদম মন নেই। মন শুধু দুষ্টুমিতে। কত রকম যে তার দুষ্টুমি, সে কি আর বলে শেষ করা যাবে! তার দুষ্টুমির গল্প কিন্তু অন্য। আজকের গল্পটা কিন্তু তার দুষ্টুমি নিয়ে নয়।

যা বলছিলাম, শীলা করল ফেল। রিপোর্ট কার্ড হাতে নিয়ে দু' চোখ ফুলিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ফিরল বাড়ি। অবশ্য ফেরার পথে যে জঙ্গলবাড়ি, সেখানে সারাজীবন দাঁড়িয়ে থাকার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু এত বড়-বড় মশা ওখানে যে, সম্ভব হয়নি। এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার ফল হয়েছে ছত্রিশটা মশার কামড়। বন্ধুরা ভাবছ বুঝি, এটা তা হলে শীলা এবং কিছু মশার গল্প। তা কিন্তু নয়!

শীলা বাড়ি ফিরে কথাই আর বলতে পারে না কান্নার তোড়ে। পুরো লাইন তার বলার পর দু'-একটি শব্দ বোঝা যায় মাত্র। শীলার ছোটমামা ক্যাপ্টেন। আর্মির মানুষ। সকলেই তাঁকে ভয় করে। একমাত্র শীলা ছাড়া। ছোটমামা তার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, মজার মানুষও। কবিতা লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন একজন কবি, তিনিও। বৃষ্টি শীলার খুব প্রিয়। তাই শীলার জন্য এই ক'দিন আগে বৃষ্টি নিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটি কবিতা লিখে দিয়েছেন। কবিতাটি শীলার মুখস্থ।

বৃষ্টি এল ঝুপ করে,
বসে আছি চুপ করে।
চায়ের সঙ্গে চানাচুর,
ভেসে এল চেনা সুর।
সূর্যমশাই গেল কই?
অবাক হয়ে চেয়ে রই।

সূর্যমশাই কোথায় গিয়েছিলেন, সেদিন তা নিয়ে শীলার ভাবার ফুরসতই ছিল না। শুধু অবাক হয়ে চেয়েছিল মামার দিকে। এত তাড়াতাড়ি কীভাবে মিলিয়ে ফেললেন মামা! মামা নিশ্চয়ই জাদু জানেন।

ছোটমামা ফাইনাল পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ডে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারলেন আসল ঘটনা কী, "কী মামণি, কান্না পাচ্ছে?"

জবাবে কিছুই বলে না শীলা। শুধুই কাঁদে।

"কাঁদো। কান্না পেলে কাঁদতে হয়। তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি কম হয়। কান্না পেলে কখনওই কান্না চেপে রাখবে না। জোরে-জোরে কাঁদবে। গলা খুলে কাঁদবে। জোরে কাঁদো মামণি, জোরে কাঁদো। আরও জোরে কাঁদো।"

ছোটমামার এমন কথা শুনে তার মন খারাপ ছাপিয়ে অবাক ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সুযোগে ছোটমামা বললেন, "কান্না থামলেই একটা কথা বলব, যা শুনলেই তুমি হাসতে পারবে।"

কান্না গেল থেমে। শীলা চুপচাপ।

"গুড। তুমি যে ফেল করবে আমি জানতাম এবং এটাও জানি, আগামীবার তুমি সেকেন্ড হবে।"

শীলার বিশ্বাস হতে চায় না। চোখ মুছতে-মুছতে সে বলল, "কীভাবে?"

"তোমার সঙ্গে পাঁচশো টাকা বাজি। আগামীবার তুমি হবে ক্লাসের সেকেন্ড গার্ল। ফার্স্ট হতে পারলে অবশ্য ভাল হত। কিন্তু তুমি হবে সেকেন্ড গার্ল। শীলা দ্য সেকেন্ড গার্ল।"

ছোটমামা কথার ফাঁকে শীলাকে কোলে তুলে নিয়ে দু' গালে দু'টো চুমু খেয়ে ফেললেন। শীলার লজ্জা করতে লাগল। সে বড় হয়েছে না! ক্লাস থ্রি-তে পড়ে এখন।

তার পর ফেল উপলক্ষে ছোটমামার সঙ্গে সাতষট্টি টাকার মিষ্টি খায় শীলা দোকানে বসে। মামার যুক্তি হচ্ছে, শীলা ফেল করে অত্যন্ত মেধার পরিচয় দিয়েছে। পাশ তো সকলেই করে। ফেল করতে পারে ক'জন? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয় অত্যন্ত মেধাবীরা। আর ফেলও করে, যাদের মেধা বেশি, পড়াশোনায় মনোযোগ কম, তারা। অতএব প্রমাণ হয়েছে শীলা মেধাবী। অঙ্কে পেয়েছে একশোয় শূন্য। দু'টো শূন্য। খাতায় হাফফালি ডিমের মতো দেখানোর কথা। একশোয় শূন্য পাওয়া সোজা ব্যাপার নয়। গর্বের ব্যাপার। মামা বললেন, "ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অব সাকসেস।"

এর পর থেকে কেউ শীলার রেজাল্ট জানতে চাইলে সে অত্যন্ত মিষ্টি এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে বলেছে, "ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অব সাকসেস। আমি এবার অঙ্কে শূন্য পেয়ে ফেল করেছি।"

মামার এই বুদ্ধিটা বেশ কাজের। লোকজন শীলার বলার ভঙ্গিতে এত মজা পায় যে, ওদের দু'-একজন পিলার আরও শক্ত করার জন্য আবার ফেল করবার ব্যাপারে রীতিমতো উৎসাহ দিয়ে ফেলে। ঘটনা কিন্তু এখানে শেষ নয়, বরং শুরু। সেদিন সকালের কথাই ধরি না কেন। খুব ভোরে শীলার ঘুম ভাঙল চড়ুই পাখির চিড়িকমিড়িক শব্দ শুনে। শরতের সকাল, আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘগুলো দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। মনে হয়, পাহাড়ি বরফ দিয়ে বুঝি কেউ একজন বিদেশি পুতুলের মুখ বানিয়ে ফুঁ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে নীল আকাশে। আর সেই মেঘের গাড়ি বোকার মতো চলছে তো চলছেই। থামার আর নাম নেই। কোথায় যাচ্ছে কে জানে! অবশ্য মামা হলে বলতে পারতেন। জিজ্ঞেস করতে হবে, 'এই যে মেঘেরা যায়... যায়...যায়ই...! তারা কোন স্টেশনে যায়?' মামা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন।

শীলার ধারণা, তার মামা এক মস্ত জাদুকর। সকলে জানে না, শীলা জানে। অনেক কথাই আগেভাগে বলে ফেলতে পারেন মামা। যেমন ধরা যাক, মায়ের সোনার দুল হারিয়ে গেল। নেই, নেই, নেই, কোথাও নেই। মামা বললেন, "দুল পাবে আগামীকাল। যে বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছ, দুল ফেরত আসবে সেই বাড়ি থেকেই। দুল তুমি হারিয়েছ সেখানেই। বৃথা আর খুঁজে কষ্ট কোরো না।"

তাই হল পরদিন।

এরপর যদি শ্যামকাকুর চাকরির কথাই ধরি। পাশের বাড়ির শ্যামকাকুর চাকরি হয় না, হয় না। শেষ পর্যন্ত মামা বললেন, "এবার কিন্তু মিষ্টি খাওয়াতেই হচ্ছে। চাকরিটা যে পেয়েই যাচ্ছিস!"

শ্যামকাকু যে কী বোকা না! কথা না শুনে শিশুদের মতো ভ্যাঁ করে কেঁদে দিলেন। এভাবে কাঁদতে আছে বুঝি! চাকরি পেলে লোকে কাঁদে নাকি? এটা তো একটা খুশির ব্যাপার। এর ক'দিন পর এক হাঁড়ি বড়-বড় রসগোল্লা নিয়ে শ্যামকাকু আমাদের বাড়িতে হাজির। কাকু চাকরি পেয়েছেন।

শীলা প্রশ্ন করল, "কী কাকু, আজ যে হাসছ? সেদিন কাঁদলে কেন?"

"খুশিতে মামণি, খুশিতে কেঁদেছি।"

"আজও তো তা হলে তোমার খুশির দিনই চাকরি পেয়েছ। আজও তা হলে কেঁদে দেখাও। রেডি, ওয়ান...টু...থ্রি।"

"কাঁদছি, এখনই কাঁদছি।" বলে হাসতে থাকেন শ্যামকাকু। হাসি আর তাঁর থামেই না। মনে হচ্ছে, তাঁকে কেউ কাতুকুতু দিচ্ছে, নইলে এত হাসি আসে কোথা থেকে?

এই মামা যদি শীলার সঙ্গে পাঁচশো টাকার বাজি ধরে বসেন, তা হলে বিশ্বাস কিন্তু করতেই হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, শীলারও আজকাল মনে হচ্ছে সে সেকেন্ড হবে। মামা মিথ্যে করে বললে কিন্তু ফার্স্ট হবে এটা বলতে পারতেন, তা কিন্তু বলেননি।

হাত-মুখ ধুয়ে হাল্কা কিছু খেয়ে বই খুলতেই সবকিছুই কেমন সহজ লাগে। কঠিন কী করেই বা লাগবে! যে মেয়ে আগামীবার সেকেন্ড হবে তার কাছে আবার কঠিন কী! ইজি-ইজি, অল ইজি। পাঠ্য বইগুলোকে শীলার মনে হয়, এক মজার খেলনা। মনে হয়, যেন বেণী করে তার সামনে ঘুরছে বই-পুতুলরা। বাংলা বইয়ের সঙ্গে সে বিয়ে দেয় অঙ্কর। আর সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের। এভাবে একটা বইয়ের সঙ্গে আর-একটা বইয়ের বিয়ে দেয়। আর সব পড়ে থাকে। থাক, ওদের বিয়ের দরকার নেই। যে বইগুলোর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সেগুলো সব সময় এক সঙ্গে পড়ে, রুটিন মাফিক। ওদিকে কিন্তু

ছোটদের বিজ্ঞান বিষয়ক বই
ডঃ শিবেন্দ্রকুমার সাহা ও ডঃ রমেন মজুমদার — রক্ত পরিচয় — ২০
শ্রীজিৎ ভট্টাচার্য — শরীর নিয়ে প্রশ্ন — ২৫
কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় — সংস্কার, কুসংস্কার ও বিশ্বাস — ২৫
রমেন মজুমদার — শোয়া বসা দাঁড়ানো — ২৫,
— শিশু কিশোরকিশোরী যুবকযুবতী — ২৫,
— আহার নিদ্রা ব্যায়াম — ২৫
আবীর গুপ্ত — বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টি — ২৫
জ্যোতিভূষণ চাকী — আচার ব্যবহার — ২৫
বেস্টবুক্স ১এ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ ☎ ২২৫৭ ১০৯৬

সি পি এমের ভোটে জেতার কৌশল নিয়ে সাহসী সাংবাদিক প্রবীর ঘোষালের বই
সি পি এমের রিগিং ৫০
ভূমিকা লিখেছেন সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত

ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের উপন্যাস সম্ভার
ঐতিহাসিক উপন্যাস সমগ্র
৫৯২ পাতা, ৫টি উপন্যাস, দামী কাগজ। এখন ২০০

এখন মাত্র ১০০ টাকায় সুদৃশ্য, বোর্ড বাঁধাই
সাংবাদিক অনুপম অধিকারী-র
চলুন বেড়িয়ে আসি
কোথায়, কিভাবে যাবেন, থাকবেন, দেখবেন, খরচ—সঙ্গে ম্যাপ, ছবি, চার্ট, ট্রেকিং রুট ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ। একবার কিনলে আজীবন ভ্রমণ।

বাংলায় সেরা হতে রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়ের
ভাবসম্প্রসারণ সমগ্র ৪০ সমাস সমগ্র ২৫
সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ সমগ্র ২৫
সমার্থক শব্দ ৪০ বিপরীতার্থক শব্দ ৫০

মুখার্জি পাবলিশিং ৮বি/২ টেমার লেন, কল-৯
২২৪১২০৯৭/৯৪৩৩১৩৮৪১০/৯৯০৩১৭৮৪৮৬

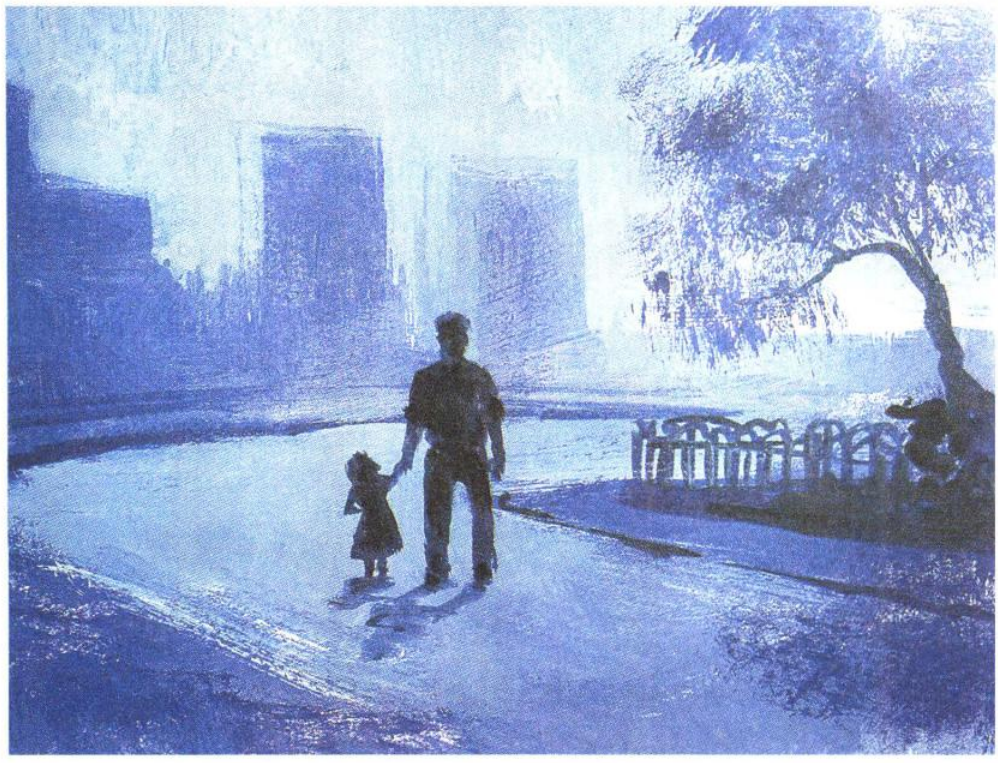

মেঘ-পুতুলরা ভাসতেই থাকে। কোথায় যে যায় ওরা... মামাকে আর জিজ্ঞেসই করা হয় না লেখাপড়ার চাপে।

এমন করে দিন যায়। গভীর সমুদ্রে ভেসে ওঠা নীল তিমির মাথার মতো হুট করে পরীক্ষার দিনও চলে আসে। আর তার চেয়েও দ্রুত পরীক্ষাগুলো শেষও হয়ে যায়। ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে টুনটুনি পাখির মতো তিড়িংবিড়িং গঙ্গাফড়িং হয়ে ঘুরে বেড়ায় শীলা।

পরীক্ষা দেওয়ার পর অবশ্য শীলার ধারণা পালটে গিয়েছে। মামা সম্ভবত এই প্রথম বাজিতে হারতে যাচ্ছেন। যেমন পরীক্ষা হয়েছে, তাতে বড়জোর চতুর্থ বা পঞ্চম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শীলার। শীলার সেকেন্ড হওয়া হচ্ছে না কিছুতেই!

পরীক্ষার ফল প্রতিবারের মতো টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে ইশকুলের বারান্দায়। ভিড়টাই বলে দেয় আজকের দিনটা সকলের কী টেনশনেই না কেটেছে। ভিড়ের ভিতর কষ্টেসৃষ্টে ঢুকে পড়ে শীলা। ভিড়ের জন্যে ধাক্কাধাক্কিতে স্থিরভাবে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। সপ্তম সবিতা, ষষ্ঠ আলপনা, পঞ্চম সুষমা, চতুর্থ মালতী...। শীলা চারদিকে ধোঁয়ার মতো দেখতে থাকে। এবারও সে ফেল করে বসেনি তো! কামারের হাপরের মতো তার বুকের ধকধক শব্দ হঠাৎ বেড়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ চোরাবালি তার পা দু'টোকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। এই শক্ত মেঝেতেও মনে হচ্ছে, এখনই সে পাতালে প্রবেশ করবে। অনেক কষ্টে নিজেকে ধরে রেখে আবার পড়তে শুরু করল, তৃতীয় অনুষ্কা, দ্বিতীয় অঙ্কিতা... আর সম্ভব হল না শীলার পক্ষে। সে যে এবারও নিশ্চিত ফেল করেছে, এটি তার বুঝতে আর বাকি রইল না। অঙ্কিতা নামটি কী করে কুয়াশায় ঢেকে গেল, সেটি বোঝার আগেই ঢলে পড়ে গেল শীলা ইশকুলের বারান্দার মেঝেয়। ভিড়টা এবার সরে এসে ঘিরে ধরল শীলার অচেতন মুখ। চোখ যখন খুলল শীলা, দেখতে পেল, তার সহপাঠীদের অনেক চোখ তার দিকে। একজন সমানে জলের ছিটে দিয়ে যাচ্ছে তার মুখে। এরই মধ্যে অঙ্কিতা তার কাঁধে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কনগ্র্যাচুলেশন বন্ধু, তুমি ফার্স্ট হয়েছ।"

শীলা বলল, "অ্যাঁ!" বলেই আবার জ্ঞান হারাল। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুলেই দেখতে পেল, ভিড়টা আরও বড় হয়েছে। মাস্টারমশাইদের মুখও যোগ হয়েছে এই ভিড়ে। এবার জলের ছিটের সঙ্গে বই, খাতাকে পাখা বানিয়ে বাতাসও চলছে। মালতীর কাঁধে ভর করে উঠে দাঁড়াল শীলা। খুব লজ্জা-লজ্জা করছে তার। ছিঃ! কী ঘটনা!

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এসে শুরু করলেন হম্বিতম্বি, "আজকালকার অভিভাবকদের কোনও কমনসেন্স নেই। অসুস্থ বাচ্চাকে একা-একা পাঠিয়ে দিয়েছেন রেজাল্ট নিতে। এখন কেমন আছ তুমি?" প্রশ্নটা শীলার কুশল জানার উদ্দেশ্যে।

বান্ধবীর কাঁধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে শীলা বলল, "ভাল ম্যাডাম।"

"কী, আবার নিশ্চয়ই ফেল করেছ?"

সকলে একসঙ্গে বলল, " না ম্যাডাম, শীলা এবার ফার্স্ট হয়েছে।"

ম্যাডাম অত্যন্ত ভয় পেয়ে শীলার মুখের দিকে তাকালেন।

শীলা ধীরে-ধীরে ইশকুলের বারান্দা পার হয়ে মাঠ পেরোতেই দেখতে পেল, ছোটমামার প্রিয় মুখখানি। মামা তাঁর ইউনিফর্ম পরা। মনে হচ্ছে এখনই যুদ্ধে যাবেন। মামাকে দেখে পর-পর লাগছে। মনে হচ্ছে মামা নন, আর্মির মানুষ।

মামা এসেই ছোট্ট একটা পাখির বাচ্চার মতো কোলে তুলে নিলেন শীলাকে। মামার চুল মুঠোয় ধরে শীলা বলল, "মামা, তুমি বাজিতে হেরে গিয়েছ। আমি সেকেন্ড হইনি। ফার্স্ট হয়েছি।"

"জানি মামণি। আমি তোমার কাছে হারতে পেরে বেশি খুশি হয়েছি। এই নাও পাঁচশো টাকা।"

মামা যে কী না! বলতে-বলতে চুমু খেয়ে ফেলেন দু' গালে। এখন যে শীলা আরও বড় হয়েছে। ক্লাস ফোর-এ পড়ে!

শীলা মামার হাত ছুঁয়ে হেঁটে যেতে থাকে বড় রাস্তা ধরে, "মামা, আমি তো এখন আরও বড় হয়েছি!"

"হুঁ।"

"এখন ক্লাস ফোরে পড়ি।"

"হুঁ।"

"বাবা বেঁচে থাকলে কত খুশি হতেন!"

"হুঁ।"

"বাবা কি মেঘ-পুতুলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান?"

"হুঁ।"

"আমরা কি আজ অনেক মজা করব?"

"হুঁ।"

"মামা, তুমি শুধু হুঁ হুঁ করছ কেন?"

"হুঁ।"

"আবার!"

"হুঁ।"

এবার দু'জনেই এক সঙ্গে হেসে ফেলেন।

ছবি: সৌরীশ মিত্র

আমার সম্পাদক শিকার

গল্প: শিবরাম চক্রবর্তী
ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

কৃষিতত্ত্বের অফিসে সকালবেলা...
পাঁচশো কপি চাই।
প্রচণ্ড চাহিদা।
তিনশো।
দু'শো।
কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় দশ হাজার কপি কাগজ বিক্রি হয়ে গেল।
শিবরাম মনে-মনে উৎফুল্ল।
হুঁ হুঁ বাবা! একেই বলে সম্পাদকীয় লেখা! একেবারে হাতেনাতে ফল।
সেদিন সন্ধেবেলা...
বাবু! বাইরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে!
হরে, আমি বেরোচ্ছি।
বাইরে এসে...
ইনি! ইনিই!
নতুন সম্পাদক?
ওঁর চোখটা কীরকম দেখেছ?
দেখে মনে হয় না!
ভাবা যাচ্ছে না। সম্পাদকমশাইকে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানাতে হবে।
পরদিন সকালবেলা অফিসের সামনে...
?!
ঘরে ঢুকে...
এ কী অবস্থা!?

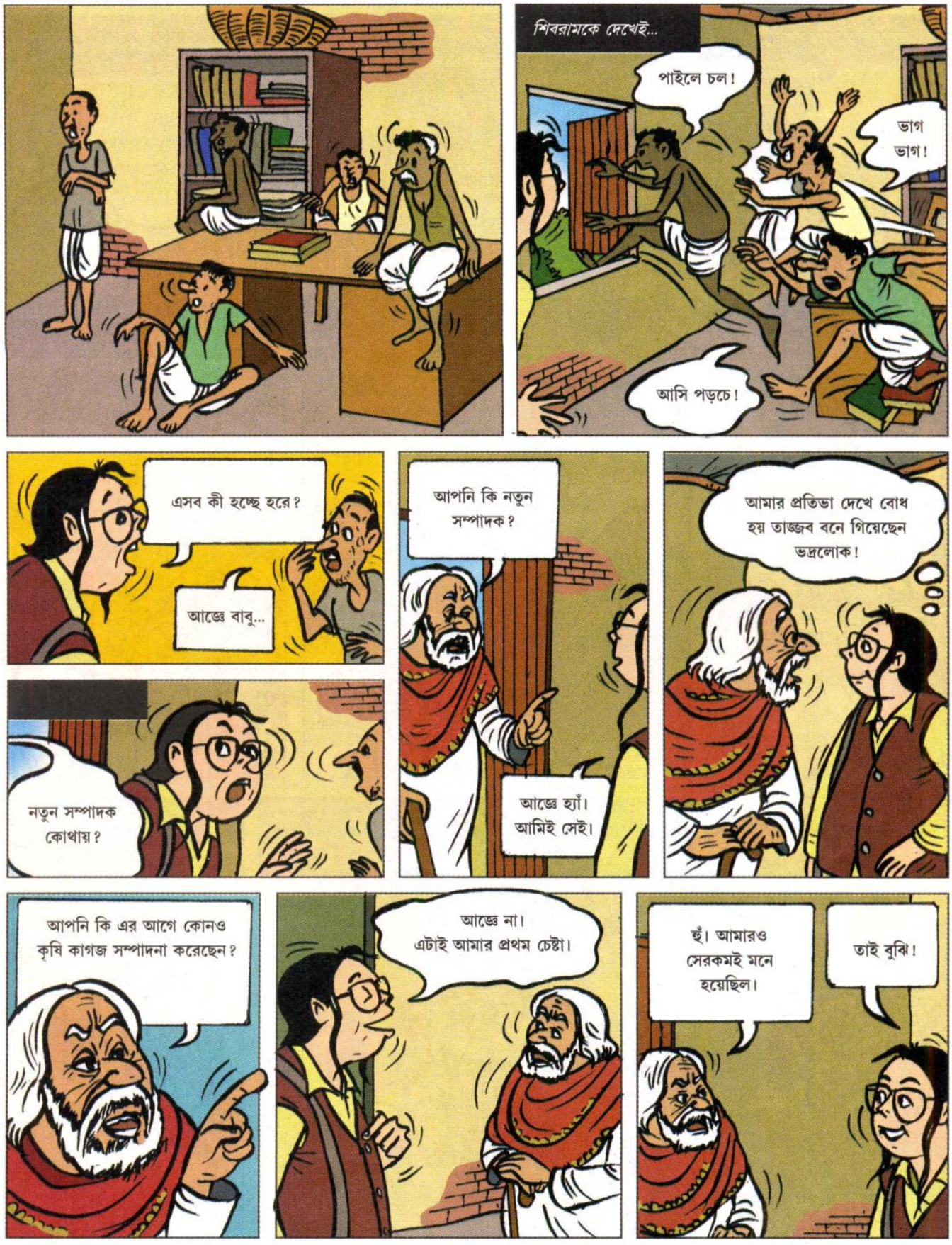
শিবরামকে দেখেই...
পাইলে চল!
ভাগ ভাগ!
আসি পড়চে!
এসব কী হচ্ছে হরে?
আজ্ঞে বাবু...
আপনি কি নতুন সম্পাদক?
আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই সেই।
আমার প্রতিভা দেখে বোধ হয় তাজ্জব বনে গিয়েছেন ভদ্রলোক!
নতুন সম্পাদক কোথায়?
আপনি কি এর আগে কোনও কৃষি কাগজ সম্পাদনা করেছেন?
আজ্ঞে না। এটাই আমার প্রথম চেষ্টা।
হুঁ। আমারও সেরকমই মনে হয়েছিল।
তাই বুঝি!

আচ্ছা, হাতে-কলমে কৃষিকাজের কোনও অভিজ্ঞতা আছে আপনার?
একেবারেই না।
সেটাই স্বাভাবিক!
এই 'সম্পাদকীয়' লেখাটা আপনারই তো?
এটাও আপনি ঠিক ধরেছেন।
আপনি এখানে মুলো সম্বন্ধে লিখেছেন...
মুলো জিনিসটা পাড়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কখনওই টেনে ছেঁড়া উচিত নয়। ওতে মুলোর ক্ষতি হয়। তার চেয়ে বরং ছেলেকে গাছের উপর উঠিয়ে দিয়ে ডালপালা নাড়তে দিলে ভাল। নাড়লেই টপাটপ মুলোবৃষ্টি হবে। তখন যত ইচ্ছে কুড়িয়ে নাও...
এর মানে কী আমি জানতে চাই?
আপনি কি জানেন, আমাদের দেশে হাজার-হাজার মুলো এইভাবে নষ্ট হয়? এতে শুধু মুলোরই অপকার নয়, দেশের সর্বনাশও বটে। তার চেয়ে যদি মুলোকে গাছেই...
কেন? মানে তো স্পষ্ট!
চোপ! একদম চুপ! নিকুচি করেছে গাছের!

মুলো গাছেই জন্মায় না।
অসম্ভব। মানুষ ছাড়া সব কিছুই গাছে জন্মায়, এমনকী বাঁদর পর্যন্ত।
মিনিট দশেক পর ধূমকেতুর প্রস্থান।
অদ্ভুত আচরণ। লোকটা কোনও ইশকুলমাস্টার নয় তো? এত রেগে যাওয়ার কী আছে?
ইস, ঘরের কী অবস্থা করেছে!
আমি গুছিয়ে দিচ্ছি বাবু।

এবার আগামী সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'টা লিখে ফেলতে হবে।
হঠাৎ...
কে, কে ওখানে?
একজন বদখত চেহারার লোক ঘরে এসে ঢুকল।
এই যে তুমি! তুমিই লিখেছ তো এটা? পড়ো, এখানটা পড়ো।
মা...মানে?
তাড়াতাড়ি পড়ো, ভারী কষ্ট হচ্ছে আমার।
পড়া শুরু হল...
মুলোর মতো আলুর বেলায় চলবে না। গাছে নাড়া দিয়ে আলু পাড়লে আলু নষ্ট হয়। আলুকে গাছে বাড়তে দিতে হবে। বাড়তে দিলে এক-একটা আলু তরমুজের মতো বড় হতে পারে। আলু বেড়ে উঠলে এক-একটা ফজলি আমের মতো করে পেড়ে ফেলতে হবে।
আরও আছে, আরও। পড়তে থাকো।

তবে পেঁয়াজ আমরা আঁকশি দিয়ে পাড়তে পারি। তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। অনেকের ধারণা, পেঁয়াজ গাছের ফল, কিন্তু আসলে তা নয়। বরং ওকে ফুল বলা যেতে পারে। ওর খোসা ছাড়ানো মানেই ওর কোরক ছাড়ানো। পেঁয়াজেরই অন্য নাম শতদল।
বাতাবিলেবুর গাছে কমলালেবু ফলানোর সহজ উপায় হল—
ব্যস, ব্যস, এতেই হবে। থামো!
আমি জানি, আমার মাথা ঠিকই আছে। কেননা, তুমি যা পড়লে আমিও তাই পড়েছি। যদিও আমার বাড়ির লোকরা ভাবে, আমার নাকি মাথা খারাপ, কিন্তু আমি মানতে পারিনি...
না না! আপনার মাথা অনেকের চেয়ে বেশি ঠিক আছে, আসলে একজন বুড়ো লোক...
থাক সে কথা। আজ সকালে তোমার কাগজ পড়ার পর আমার বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে। আমার মাথা সত্যিই খারাপ, আমি পাগল!
অ্যাঁ!?
হ্যাঁ। আর এ-কথা বোঝামাত্রই আমি প্রচণ্ড চিৎকার করে এই লাঠি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। কাউকে খুন না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।
বেরোবার আগে আমি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে এসেছি। রাস্তায় যাকে পেয়েছি ধরে ঠেঙিয়েছি। কারও মাথা ভেঙেছে, কারও পা, কারও বা হাত।
শুধু এক ব্যাটাকে ধরতে পারিনি, সে ব্যাটা গাছে চড়ে বসে আছে!

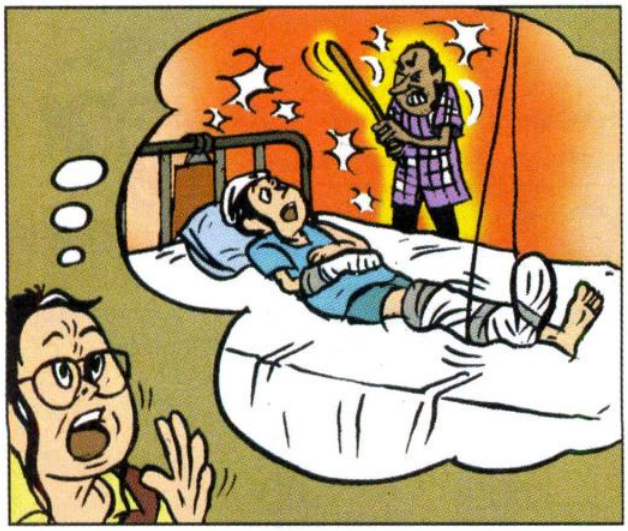

যে গাছে চড়ে বসে আছে, এবার তার সঙ্গে বোঝাপড়া করব! চলি, ন-ম-স্কা-র।

ওঃ। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!

আমার লেখার জন্য এত লোক খুনজখম হল, হাত-পা ভাঙল! নাঃ। ব্যাপারটা ভাল হল না।

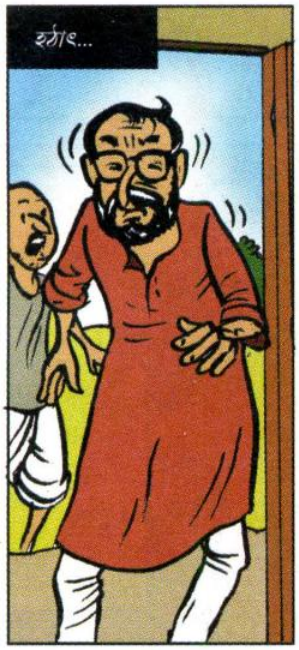
হঠাৎ...

আরে আপনি! এখন? সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?

হরে, বসার টুলটা দিয়ে যা।

সম্পাদক চেয়ারে বসে নিশ্চুপ।

সম্পাদকমশাই বোধ হয় আনন্দে ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন!

তুমি আমার কাগজের সর্বনাশ করেছ।
কী বলছেন? কাটতি তো অনেক বেড়েছে!

হ্যাঁ। কাগজ বহুত কেটেছে আমি জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মাথাটা কাটা গিয়েছে।

তার মানে?
কাগজ বিক্রি এত বেশি কোনও দিন হয়নি। নামডাকও হয়েছে সেটা মানছি। কিন্তু পাগলামির জন্য বিখ্যাত হয়ে লাভ কী?

সত্যি বড় দুঃখের বিষয়। 'কৃষিতত্ত্ব'-র এত বড় বদনাম বোধ হয় আর ঘুচবে না।

একবার জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দ্যাখো, কীরকম ভিড়। সবাই দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে দেখবে বলে। তাদের ধারণা, তুমি বদ্ধ পাগল।

কী পাগলামো দেখলেন আমার মধ্যে?
তোমার মধ্যে না, তোমার লেখার মধ্যে। মুলো, আলু, পেঁয়াজ, এগুলো গাছে জন্মায়, তোমাকে কে বলল? পেঁয়াজ ফল নয়, ফুল। আশ্চর্যজনক খবর। কপি শুধুমাত্র হাতির খাদ্য ছিল, এখবর তোমাকে কে দিল? তুমি লিখেছ, শামুকেরা অতি উৎকৃষ্ট সার, কচ্ছপেরা নাকি সঙ্গীতপ্রিয়, তুমি কি পাগল?

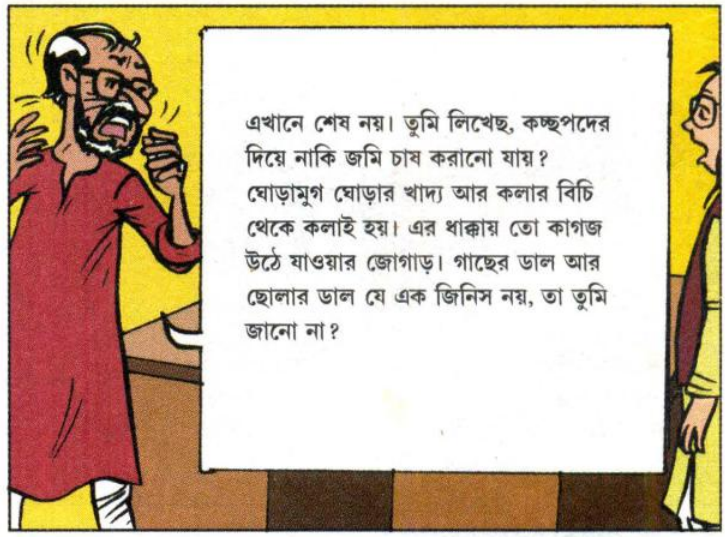
এখানে শেষ নয়। তুমি লিখেছ, কচ্ছপদের দিয়ে নাকি জমি চাষ করানো যায়? ঘোড়ামুগ ঘোড়ার খাদ্য আর কলার বিচি থেকে কলাই হয়। এর ধাক্কায় তো কাগজ উঠে যাওয়ার জোগাড়। গাছের ডাল আর ছোলার ডাল যে এক জিনিস নয়, তা তুমি জানো না?

যাক্, যা হওয়ার হয়েছে। এবার তুমি বিদায় নাও। তোমার আর সম্পাদনা করে কাজ নেই। আমারও আর বায়ু পরিবর্তনের দরকার নেই। বেরিবেরিতে প্রাণ যায় যাবে!

ভাগ্যিস সামনের সংখ্যা বেরনোর আগে আমি ফিরে এসেছি। নইলে ভগবান জানেন, কী ঘটাতে তুমি?
যথেষ্ট হয়েছে! আমার কথাটাও শুনুন তা হলে।

আপনি একটি আস্ত বাঁধাকপি। কাগজের সম্পাদক হতে গেলে কোনও কিছু জানতে হয়, তা আমি এই প্রথম জানলাম। কিন্তু আপনার মাথায় এসব ঢুকবে না। নইলে বুঝতেন, কাগজের আর আপনার কী সাংঘাতিক উন্নতি করেছি আমি।

কী, কী বলছ এসব?
কী আর বলব? পালংশাক, তালশাঁস যা খুশি বলা যায় আপনাকে। আপনাকে পাতিলেবু বললে লেবুর অপমান করা হয়।
হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক যে, সম্পাদক হওয়ার জন্য আমি জন্মাইনি। আমি হচ্ছি লেখক, বুঝলেন? সম্পাদক হয় কারা, এই আপনার মতো লোক। আমি এই মুহূর্তে আপনার চাষের কাগজের সম্পাদকগিরি থেকে ইস্তফা দিচ্ছি।
তা ছাড়া কি ঘড়ি-দুর্দশা দেখেই আমার শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। আমি যাচ্ছি, কিন্তু জানবেন আমার কর্তব্য আমি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি। বলেছিলাম আপনার কাগজকে সর্বশ্রেণির পাঠ্য করে তুলব। তুলেছি। গ্রাহকের সংখ্যাও প্রায় দশ হাজার করে দিয়েছি।
স-সর্বশ্রেণির পাঠ্য?
হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার পাঠক তো ছিল যত চাষাভুষো লোকজন। কিন্তু এখন আপনার পাঠক কারা, যত ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার, প্রোফেসর, সব শিক্ষিত লোকেরা। একজনও চাষি নেই ওর ভিতরে। যারা ছিল তারা সব চিঠি লিখে কাগজ ছেড়ে দিয়েছে।
অ্যাঁ? বলো কী?!
ঠিকই বলছি। এই আলমারির ভিতরে চিঠির গাদা আছে, খুঁজলেই পেয়ে যাবেন।
কিন্তু আপনি এমনই চালকুমড়ো লোক যে, ওই পাঁচশো মুখ্যু চাষার জন্য বিশ হাজার উচ্চ শিক্ষিত পাঠক হারালেন। আমার আর কী! ক্ষতি আপনারই হল। আমি চললাম।

(সমাপ্ত)

শিকারবাড়ি রহস্য

শুভমানস ঘোষ

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস দু'সংখ্যায় সমাপ্য

আগে যা ঘটেছে: 'সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব'-এর সদস্যরা পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা লালতটিতে এসে পৌঁছেছে। ছোটকাকা এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। সৌমিতা, তার ভাই তাতান, বাবলি, পপাই সঙ্গে আছে এবার। সঙ্গে আছেন সৌমিতার বাবা-মাও। সেখানে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল ছোটকাকার। তাঁর নাম পর্বত গড়াই। ওখানকার ডি এফ ও সুসময় নন্দী জঙ্গলে যেতে বারণ করেছেন সকলকে। ওখানে নাকি অস্ত্র কেনাবেচা চলে। তাই বিপদের আশঙ্কা। এই শুনে ছোটকাকা রাগ-রাগ গলায় বললেন, "ভাবছি আজই আমরা ফিরে যাব।" এরপর...

কালভার্ট ক্রস করে আধ মিনিট লাগল মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি পৌঁছতে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। পিঠের উপর বিশাল এক পাহাড়ের ক্যানভাস। এক পশলা বৃষ্টির পর নীল আকাশ আর সবুজ বনের মাঝখানে ফুটে থাকা পাহাড়টা কী যে সুন্দর লাগছিল! সৌমিতা হাঁ করে চেয়ে রইল।

মাস্টারমশাইয়ের পাকা বাড়ি। চারপাশে বাউন্ডারি ওয়াল। ভিতরে মস্ত বড় ইঁদারা। একটু ফুলের বাগান, কয়েকটা গাছ, একটা ধানের মরাই। এত বড় একটা বাড়ি, কিন্তু লোকজনের সাড়া নেই। জানা গেল, মাস্টারমশাইয়ের নিকটজন বলে কেউ নেই। স্ত্রী ছিলেন, তিনিও মারা গিয়েছেন হালে। ফলে একজন কাজের লোক নিয়ে এত বড় বাড়িতে সারা বছর একাই থাকতে হয় তাঁকে।

তাতান জিজ্ঞেস করল, "আপনার ভয় করে না মাস্টারমশাই? চারপাশেই তো ফাঁকা মাঠ।"

"ভয়?" মাস্টারমশাই হা হা করে হাসলেন, "আমরা গাঁয়ের লোক, ভয় করলে টিকতে পারব এখানে? তবে আমার বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, এই বাড়ির চেহারাই ছিল আলাদা। লোকজন, আত্মীয়স্বজন, ঠাকুর, কাজের লোক, মুনিষ, গোরু-ছাগল—সব সময় বাড়ি গমগম করছে। তখন তো এখানে ড্যাম হয়নি, বিস্তর জমিজমা আমাদের! এখন কয়েক বিঘে ছাড়া আর কিছুই নেই। শিকারির ছেলে মাস্টারমশাই হলে এমনই হয়!

বাইরে গাছের ছায়ায় দু'টো খাটিয়া পেতে দেওয়া হয়েছে। তার উপর বসে গল্প হচ্ছিল। চারপাশে রোদ্দুর চকচক করছে। সকলেই ঘেমে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্লান্তি নেই বাবলির। ঘেমেনেয়ে সারা বাড়ি দৌড়ে-দৌড়ে বেড়াচ্ছিল।

মাস্টারমশাইয়ের কাজের লোকটির অনেক বয়স। ভুরু পেকে গুটিয়ে পাকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও কাজেকর্মে বেশ শক্ত। ইঁদারা থেকে ঠান্ডা টাটকা জল তুলে সকলকে চমৎকার শরবত বানিয়ে দিল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

মাস্টারমশাই বললেন, "ওর নাম সনাতন। বাবার আমলের লোকজনদের মধ্যে ওই একজনই টিকে আছে। শিকারে বেরিয়ে বাবার সনাতনকে না হলে চলত না।"

পপাই বলল, "মাস্টারমশাই, আপনার বাবার শিকারের বাড়িটা দেখাবেন না আমাদের? সেই যে কাল বলছিলেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঝিলের ধারে। জঙ্গলের মধ্যে। শিকারবাড়ি," সৌমিতা জুড়ল।

"শিকারবাড়ি, অ্যাঁ?" মাস্টারমশাই আঙুল তুলে দিলেন রঘুর দিকে, "এই যে তোমাদের জেড ক্যাটিগরি। ও দেবে যেতে?"

পপাই ছোটকাকার দিকে ফিরল, "কালকের দিনটা তো শুধু আছি। তা হলে সুসময়কাকুকে বলে কাল ফোর্স নিয়ে যাই, চলো।"

ছোটকাকা বলে উঠলেন, "আর ফোর্সে কাজ নেই পপাই। ভালয়-ভালয় বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি। ওফ, এই সব ফোর্স সামলে মন্ত্রীরা যে কী করে বেঁচে থাকেন কে জানে!"

আরও আধ ঘণ্টার মতো থেকে সকলে উঠে পড়লেন। এদিকে বন্দুকধারী, অন্য দিকে মা। বেশি দেরি করলে সমস্যা বাড়বে। ফেরার সময় মাস্টারমশাই তাদের কালভার্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। এবারও বাবলির আঙুল তাঁর মুঠোর মধ্যে। দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব জমে গিয়েছে। বাবলি সমানে কলকল করে চলেছে। এ মেয়ে দুরন্ত কেবল নয়, বকতেও পারে অনর্গল। ভাবতে-ভাবতে হাসি পেয়ে যাচ্ছিল সৌমিতার। কিন্তু ঠিক তখনই ঘটে গেল একটা ঘটনা। ভয়ংকর, অবিশ্বাস্য!

মাস্টারমশাই বাবলিকে নিয়ে সবে কালভার্টে পা দিয়েছেন, হঠাৎ একটা মোটরসাইকেল ছুটে এল ক্যানেলের ওপার থেকে। গাড়িতে দু'জন আরোহী, দু'জনেরই মুখ হেলমেটে ঢাকা। এরা কিছুতেই টুরিস্ট পার্টি হতে পারে না। সৌমিতার বুক গুড়গুড় করে উঠল। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে গাড়িটা। পিছনের লোকটার হাতে খোলা রিভলভার। গাট্টাগোট্টা চেহারা।

কালভার্টের উপরে উঠে সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। পিছনের লোকটার এক হাতে রিভলভার। সেটা বাবলির নাকে ঠেকিয়ে অন্য হাত দিয়ে তাকে জাপটে ধরল। তারপর প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে তাকে মাস্টারমশাইয়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে টেনে তুলে নিল গাড়িতে। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল, ভাবা যায় না।

মাস্টারমশাই চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি আবার ছুটতে শুরু করেছে। গাড়ি থেকে বাবলি অর্ধেক ঝুলছে বাইরে। সৌমিতা আর পপাই হইহই করে ছুটে গেল। কিন্তু গাড়ি হাওয়ার ধাক্কায় তাদের দু'জনের জামা বেলুনের মতো ফুলিয়ে দিয়ে কালভার্ট থেকে নেমে ডান দিকে ঘুরে গেল। এবড়োখেবড়ো পথে লাফাতে-লাফাতে উঠে পড়ছে খেতের আলে। ছোটকাকা আর রঘু ছিলেন একটু দূরে। তাঁরা প্রথমটা ঠিক ধরতে পারেননি, কী হয়েছে! সৌমিতা আর পপাইয়ের চিৎকারে তাঁরা যখন

সচেতন হলেন, ততক্ষণে গাঁ-গাঁ শব্দে মাঠ কাঁপিয়ে আলের রাস্তায় তিরবেগে ছুট লাগিয়েছে গাড়ি।

"গুলি চালাও! গুলি চালাও!" ছোটকাকা পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন।

কিন্তু কোথায় চালাবে গুলি? রঘু বন্দুক ঠিকঠাক করে লক্ষ্য স্থির করতে-করতে, বনের পথে ছোট হতে-হতে মিলিয়ে গেল মোটরবাইক।

॥ ৬ ॥

এখন রাত ন'টা। বাংলোর লাউঞ্জে টেলিফোন ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে সৌমিতারা। চিন্তায়-চিন্তায় প্রত্যেকের মুখচোখ বসে গেছে। কপালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সারি-সারি ভাঁজ। খানিক আগে মাস্টারমশাইও ছিলেন এখানে। বলে বলে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিকেলের ঘটনাটার পর তিনি সাংঘাতিক মুষড়ে পড়েছেন। বাবলির বিপদের জন্য তিনিই দায়ী বলে কপাল চাপড়াচ্ছেন আর হাহাকার করছেন।

তাঁর চেয়েও অবস্থা খারাপ মায়ের। বিকেলে সব শুনে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। কাঁদতে-কাঁদতে শুধু বলছিলেন, "মেয়েটাকে আমাদের ভরসায় রেখে গেলেন ওর বাবা, তাঁর কাছে কী জবাব দিবি তোরা?"

ছোটকাকা মাথার চুল ছিঁড়ছিলেন আর সমানে পায়চারি করছিলেন বাংলোর বারান্দায়। পপাইও ছিল তাঁর সঙ্গে। সে রাগের মাথায় নরেশ সিংহের নামে যা মুখে আসছিল বলে যাচ্ছিল। ওদিকে বাবা বারবার করে পুলিশের হেল্‌প নেওয়ার কথা বলছিলেন। কিন্তু ছোটকাকাই তাঁকে থামিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন নরেশের কাছ থেকে একটা ফোন আসবেই।

ছোটকাকা ঠিকই ধরেছিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফোন এসে গেল। ছোটকাকা মাস্টারমশাইকে নিয়ে ছুটেছিলেন ফোন ধরতে।

ফোনে কথা সেরে ছোটকাকা যখন ফিরেছিলেন, তখন তাঁর মুখচোখ অন্যরকম। ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছেন আর ঠোঁট কামড়াচ্ছেন।

"কী হল ছোটকা?" সৌমিতার গলা শুকিয়ে এল।

উত্তরে ছোটকাকা যা জানালেন, মায়ের কান্নাও থেমে গেল। নরেশ সিংহ সাফ জানিয়েছে, কাল রাত বারোটার সময় ড্যামের সাত নম্বর লকগেটের তলায় এক লাখ টাকা রেখে আসতে হবে। এর অন্যথা হলে পরের দিন বাবলির ডেডবডি নিয়ে তাঁদের কলকাতার ফিরতে হবে।"

"তুই কী বললি?" বাবা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

ছোটকাকা বলেছিলেন, "আমার কথা পরে আসছে, ওদের কথাটা শেষ করি। ওরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, পুলিশকে খবর দিলে বাবলিকে প্রাণে বাঁচতে হবে না। কেটে ড্যামের জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাবে। আমরা কী ঠিক করলাম, রাত ন'টায় ফোন করে ওরা জেনে নেবে।"

এখন সেই অপেক্ষার পালা চলছে। দরজার কাছে সিকিউরিটি দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে-উদ্বেগে তাদের মুখও শুকিয়ে গেছে। ওদের একজনের সামনে দিয়েই নরেশ বাবলিকে তুলে নিয়ে গেছে। ফলে তারাও ঘোর বিপদের মুখে। মা ভিতরের ঘরে এখনও বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছেন। চিৎকার করে কান্নাটা থেমেছে কিছুক্ষণ হল।

বিকেলের এক পশলা বৃষ্টির পর আজ আবহাওয়া নরম। হাওয়ার গতিবিধিও কিছু অন্যরকম। মধ্যে-মধ্যে দমকা হাওয়া উঠছিল এক-একটা। গাছে-গাছে পাখিদের ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। পাতার ঝোড়ো শব্দে, পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দে গোটা বাংলোটা মুহূর্তের মধ্যে সরগরম হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে বাবলির জন্য বুকের ভিতরটা আরও যেন হু হু করে উঠছিল সৌমিতার।

"ক'টা বাজল?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন ছোটকাকাকে।

ছোটকাকা তাঁর রিস্টওয়াচে চোখ ছুঁয়ে বললেন, "ন'টা পাঁচ।"

সকলে মিলে চিন্তাভাবনা করে স্থির হয়েছে, বাবলির কথা ভেবে পুলিশকে খবর দেওয়ার দরকার নেই। টাকা দিয়ে দেওয়াই ভাল। টাকার জন্য বাবলির বাবাকে রাজি করাতে হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু উনি এখনও ট্রেনে। মাঝরাতের আগে তাঁকে ধরা যাবে না। তা-ও লাইন পাওয়া গেলে। ফলে এক্ষুনি-এক্ষুনি কিছু কথা দেওয়া যাবে না নরেশকে। সময় লাগবে। অন্তত দিন দুই।

মনভোলা মাঝি এসে দাঁড়াল দরজায়। বিকেল থেকে কারও কিছু পেটে পড়েনি, এখন একটু কিছু মুখে দেওয়ার জন্য সে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল।

বাবা ঘুরলেন ছোটকাকার দিকে, "যা, তোরা খেয়ে আয়। আমি আছি ফোনে।"

ছোটকাকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আর খাওয়া! বাবলির ওদিকে কী জুটছে কে জানে! হয়তো সারা রাত না খাইয়ে ফেলে রেখে দেবে।"

ছোটকাকা চুপ করে গেলেন। সৌমিতা ওড়না দিয়ে চোখ ঢাকল। পপাই ব্যস্ত হয়ে উঠল, "তুই আবার কান্নাকাটি জুড়িস না মিতা। বসে-বসে বেকার না কেঁদে আয় না ভেবে দেখি কী করা যায়।"

ছোটকাকা তাকালেন তার দিকে। বললেন, "আর করা! টাকা দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কী করবি তুই? বাবলির বাবার কাছে কী করে যে মুখ দেখাব!"

সৌমিতা অবাক হয়ে গেল। ছোটকাকা যেন একটু বেশিই তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়েছেন। এত সহজে কিন্তু ভেঙে পড়ার লোক তিনি নন।

"তুমি এ-কথা বলছ ছোটকা? তুমি!" পপাইও বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না, আমার কিন্তু মন মানছে না। মনে হচ্ছে, আমাদের আর-একটু দেখা উচিত। একটা শেষ চেষ্টা।"

"না, না।" বাবা আপত্তি জানালেন, "রজত বলছে যখন আর শেষ চেষ্টায় কাজ নেই। পরের মেয়ে, কিছু হয়ে গেলে আমাদের সকলের হাতে হাতকড়া পড়বে।"

"ঠিক কথা। নরেশ সিংহ লোকটা ভারী খতরনক। আমরা তার সঙ্গে পেরে উঠব না।"

বলতে-বলতে ছোটকাকা ঘুরে গেলেন পপাইয়ের দিকে, "পপাই, এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কাল রাতেই ওরা একবার ট্রাই নিয়েছিল আমাদের কাউকে তোলার, কিন্তু তোর জন্য পেরে ওঠেনি। যা একখানা তাড়া লাগিয়েছিলি টর্চওলাকে।"

বাবা কৌতূহলী হলেন, "কী হয়েছিল কাল?"

ছোটকাকা মুখ খোলার আগেই ফোনটা ঝনঝন করে উঠল। ছোটকাকাকে বারণ করে বাবা রিসিভার তুলে নিলেন। হুঁ, নরেশ সিংহের ফোন। বাবা কথা বলতে শুরু করলেন। যেমন-যেমন কথা হয়েছিল তা শেষ করতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। কিন্তু বাবা আরও সময় নিলেন। বাবলি ঠিকঠাক আছে কিনা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেনে নিতে লাগলেন। সৌমিতারা দম বন্ধ করে শুনতে লাগল।

শুনে-শুনে আট মিনিট পর ফোন নামিয়ে রাখলেন বাবা। বাবলি ভাল আছে শুনে অনেকটাই রিলাক্সড। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়-গলা মুছতে-মুছতে বললেন, "আর চিন্তা নেই। ওরা রাজি। পরশু সকালে আবার ফোন করবে।"

এই বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন মাকে খবরটা দিতে। সঙ্গে-সঙ্গে 'ফাইন' বলে চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালেন ছোটকাকা। সৌমিতা আর পপাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "খেয়েদেয়ে রেডি হয়ে নে সব, অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের অভিযান শুরু হবে। অপারেশন রেসকিউ বাবলি।"

"অ্যাঁ!" পপাই অবাক হয়ে গেল।

"হ্যাঁ। আজ আমাদের কোন সিকিউরিটি আটকায় দেখি।"

সৌমিতার বুকের ভিতরটা শিরশির করে উঠল। এই তো এবার বেশ চেনা যাচ্ছে ছোটকাকাকে। তার মানে, এতক্ষণ তিনি ভয় পাওয়ার অভিনয় করছিলেন? কিন্তু কেন এই অভিনয়? প্রশ্নটা সে করেই ফেলল।

উত্তরে ছোটকাকা মাথা নেড়ে বললেন, "আমি ভয় না পেলে দাদাকে সামলানো যেত? দেখছিলি না, পুলিশ-পুলিশ করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল। আমারই তো দাদা!"

"ও এই বার বুঝেছি, বাবাকে দিয়ে এই চালটা চেলে তুমি বাবলিকে উদ্ধার করার জন্য দু' দিন সময় বের করে নিলে।" সৌমিতা বলল।

"এগ্‌জাক্টলি!"

পপাই বলল, "তোমার জবাব নেই ছোটকা। তোমার সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবকে কে আটকায়?"

ছোটকাকার গলা বদলে গেল, "তবে মনে রাখিস, এ অভিযান কিন্তু আমাদের আগের অভিযানের চেয়ে একবারে আলাদা। এত দিন আমাদের ছিল ট্রেনিং, এবার আসল পরীক্ষা। ঠিক আছে?"

বলতে-বলতে ছোটকাকার চোয়াল শক্ত হয়ে এল। কঠিন গলায় বললেন, "বাবলিকে খুঁজে বের করতেই হবে। দরকার পড়লে সমস্ত জঙ্গল তোড়পাড় করে ফেলব। নরেশ সিংহের কবল থেকে তাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।"

ছোটকাকার চোখ দু'টো আগুনের মতো জ্বলতে লাগল। তা দেখতে-দেখতে সৌমিতার গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটতে শুরু করল। পপাইয়ের মুখচোখও বদলে যাচ্ছিল। হাতের মধ্যে তার পাকিয়ে উঠছিল মুঠো। টেলিফোনটা বেজে উঠল ফের। আবার নরেশ সিংহ?

না, নরেশ সিংহ নয়। ছোটকাকা এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে কথা বলতে শুরু করলেন। ভিতরের ঘর থেকে বাবা এসে দাঁড়ালেন। ও প্রান্তে কে বোঝা না গেলেও নরেশ সিংহ নয়, ছোটকাকার কথা বলার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছিল।

"কে?" কথা শেষ করে ছোটকাকা রিসিভার নামাতেই বাবা প্রশ্ন করে উঠলেন।

"রেঞ্জ অফিসার লছমিকান্ত শর্মা। ড্যামের দিকে একটু আগে দলছুট হাতিটাকে দেখা গেছে। দু'-চারটে দোকানঘর ভাঙচুর করেছে। এদিকেও নাকি আসতে পারে। আমাদের সাবধানে থাকতে বললেন।"

"এর মধ্যে আবার হাতি!" বাবা মাথা ঝাঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কিছু বললি নাকি আমাদের কথা?"

"উহুঁ। তবে জানতে চাইছিলেন আমরা ঠিকঠাক আছি কিনা।"

"কী বললি তুই?"

"ফার্স্ট ক্লাস।"

"গুড।" বাবা হাঁফ ছাড়লেন।

ছোটকাকা বললেন, "শর্মা আর-একটা খবর দিলেন।"

"কী?"

ছোটকাকা অর্থপূর্ণ চোখে সৌমিতার দিকে তাকালেন। মাথা নেড়ে বললেন, "যে লোকটা হাতির আক্রমণে ইনজিওর্ড হয়েছিল, সে আজ দুপুরে হাজারিবাগ হসপিটালে মারা গেছে। লোকটার নাম বাবলু। সে যে নরেশেরই চ্যালা ছিল, পুলিশ কনফার্ম করেছে।"

কথা শেষ করে ছোটকাকা বাইরে বেরিয়ে সিকিউরিটি দু'জনকে অ্যালার্ট করে দিয়ে এসে মনভোলাকে চটপট খাবার দিতে বলে দিলেন। রাতে মাকে খাওয়ানো গেল না। এক গ্লাস দুধের সঙ্গে একটা ঘুমের বড়ি দিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল। তাতান ঠাঁই নিল পাশে। বিকেলের ঘটনাটার পর বেচারা এমন ঘাবড়ে গিয়েছে, কথাই বলছিল না। একেবারে থম মেরে গেছে। ছোটকাকারা বেরোবেন শুনে মিনমিন করে বলার চেষ্টা করেছিল, "আমরা এখানে একা-একা থাকব? যদি ডাকাতগুলো আসে?"

"এলে আসবে। ফাইট করবে। নইলে পারমানেন্ট হবে কী করে আমাদের ক্লাবে?" ছোটকাকা এক কথায় তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে আজও মনভোলা বাইরের আলো নিভিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে চারপাশটা যেন সমুদ্রের ফেনার মতো সুন্দর ও নরম হয়ে গেল। অপরূপ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বাংলোটা। আজ চাঁদ আরও বড়, আলো আরও বেশি। সৌমিতা আর পপাই বারান্দা থেকে নেমে এল বাংলোর কম্পাউন্ডের মধ্যে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সারা গায়ে জ্যোৎস্না মাখতে ইচ্ছে হচ্ছিল সৌমিতার। বাবলিকে নিয়ে চিন্তা না থাকলে সে হয়তো সত্যি-সত্যি সেটাই করে বসত।

"ভিতরে যান দিদিমণি। হাতি বেরিয়েছে খবর পাননি?"

সৌমিতা ঘুরে দাঁড়াল। রঘু। সঙ্গে শ্যামলালও আছে। বন্দুক বাগিয়ে একেবারে তৈরি। যখন দরকার হয় তখন কাজে লাগে না, এখন এসেছে তাকে সাবধান করতে। সৌমিতার রাগ হয়ে গেল। বলল, "না!"

"কী!"

"দাঁড়া।" বলে সৌমিতাকে থামিয়ে পপাই শক্ত গলায় বলল, "আমাদের বিরক্ত করবেন না, নিজের কাজে যান।"

তবু তারা দাঁড়িয়ে রইল। পপাই ঝেঁঝে উঠল, "কী হল, গেলেন না? শুনুন, আজ আপনাদের কোনও কথাই শুনব না। আজও রাতে বেরোব আমরা।"

সৌমিতা বিরক্তির শব্দ করল মুখ দিয়ে। সেদিনের মতো সব

গুবলেট না হয়ে যায়!

"কোথায়?" রঘু জানতে চাইল।

"বাবলিকে খুঁজতে। জঙ্গলে।"

"জঙ্গলে! জঙ্গলের ভিতরে? এই রাতে!"

পপাই বলল, "হ্যাঁ। আজ যদি আটকান, তা হলে ডি এফ ও সাহবেকে সব ঘটনা বলে দিয়ে আপনাদের নামে রিপোর্ট করব। আপনাদের চাকরি কেউ বাঁচাতে পারবে না।"

রঘু আর কথা বাড়াল না। সঙ্গীকে নিয়ে চুপচাপ সরে গেল সামনে থেকে। সৌমিতার তাক লেগে গেল। না বলে সে পারল না পপাইকে, "দারুণ ম্যানেজ করলি তো এটা! নাঃ, মাথা গরম হলে কী হবে, তোর বুদ্ধি আছে।"

পপাই বলল, "কেন, তোর এত দিন সন্দেহ ছিল?"

"একট-একটু।"

॥ ৭ ॥

সেদিন খাওয়াদাওয়ার ঘণ্টা দুই পরে অ্যাডভেঞ্চার কিট কাঁধে ঝুলিয়ে ছোটকাকা বেরিয়ে এলেন বাইরে। পিছনে পপাই। ওর পরনে কালো টি-শার্ট, টাইট জিন্‌স। সৌমিতাও শালোয়ার-কামিজ ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট পরে নিয়েছে। পায়ে চটির বদলে হান্টিং শু। এই অভিযানে প্রথমটা মত না দিলেও শেষ পর্যন্ত ছোটকাকার জেদের কাছে বাবাকে হার মানতে হয়েছে। তবে তিনি চাইছিলেন সিকিউরিটিদের অন্তত একজন তাঁদের সঙ্গে যাক। সেটাও এক কথায় না করে দিয়েছেন ছোটকাকা।

অগত্যা রঘুকে নিয়ে বাবা কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁদের। বাবা যথেষ্ট সাহসী মানুষ, কিন্তু যাওয়ার সময় তিনিও কেমন উন্মনা হয়ে পড়লেন। ছোটকাকা তাঁর দু'টো হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "দাদা, তুই একদম চিন্তা করিস না। বাবলিকে ঠিকঠাক ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমার। সেই সঙ্গে এদেরও। পৃথিবীর কোনও শক্তি নেই আমাদের টাচ করতে পারে।"

ছোটকাকার গলায় এমন একটা তেজের ভাব ছিল, বাবা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। অভিভূতভাবে বললেন, "আমি জানি! আমি জানি!"

ছোটকাকার উদ্দীপনা দেখে হঠাৎ রঘু সামনে এগিয়ে এল। ছোটকাকাকে লক্ষ করে বলল, "স্যার, আপনাদের সাহসের জবাব নেই। তবু এইভাবে খালি হাতে আপনারা জঙ্গলে ঢুকলে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব না। আমাদের তো একটা মন আছে। আমাকে আপনাদের সঙ্গে যেতে দিন স্যার।"

ছোটকাকা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে ভাবলেন। তারপর এগিয়ে এসে রঘুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "আপনি যে আমাদের কথা ভাবছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনারা আমাদের সঙ্গে গেলে আমাদের সাহস আরও বাড়ত সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপদটা সেখানেই। সাহস ভাল, বেশি সাহস নয়। নিজেরা মরব, বাচ্চা মেয়েটাকেও মারব।"

"তা হলে আপনার গিয়ে কাজ নেই।" বাবা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

মন খারাপ করে রঘু বাবাকে নিয়ে ফিরে গেল। ছোটকাকা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করলেন। ড্যামের ঠিক উলটো দিকে ক্যানেলে যাওয়া পথ। ছোটকাকার পিছন-পিছন চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চুপচাপ হেঁটে চলল সৌমিতা আর পপাই।

দু'-তিন মিনিটের মধ্যে ক্যানেল এসে গেল। সামনেই সেই কুখ্যাত কালভার্ট। এমনিতেই দিনের বেলাতেও এসব এলাকা নির্জন, থমথমে। তার উপর কয়েক ঘণ্টা আগেই এখানেই ঘটে গিয়েছে গা-হিম করা ঘটনা। সৌমিতার মতো সাহসী মেয়েরও বুকটা হঠাৎ ধকধক করে উঠল।

ক্যানেলের পরই ফাঁকা মাঠ। চারপাশে বড়-বড় পাথর। চাঁদের আলোয় তাদের কালো-কালো ছায়া ছড়িয়ে আছে। দূর থেকে দেখে হঠাৎ মনে হয়, যেন দল বেঁধে হাতি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সৌমিতা পপাইকে ঠেলল, "পপাই, ভাল করে নজর রাখিস, হাতিটা না এসে পড়ে!"

পপাই বলল, "হাতিটা মনে হয় পালিয়েছে এতক্ষণে।"

"বলা যায় না। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দেখবি তোর ঘাড়ের উপর হাতি। এটাই তো জঙ্গলে ঢোকার পথ।"

"কোই চিন্তা নেই। সঙ্গে-সঙ্গে মাস্টারমশাই যেমন বলেছেন, এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করব।"

"বলা সোজা। হাতি দেখলেই দেখবি ভয়ের চোটে সব ভুলে গিয়েছিস।"

পপাই বলল, "তা হলে এত দিন ধরে কিসের ট্রেনিং নিলুম ছোটকার কাছ থেকে?"

কিছুটা দূরে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। অন্ধকারে ডুবে আছে সারাবাড়ি। এক দিকে হাতি, অন্য দিকে গুন্ডা-বদমাশ নিয়ে ফাঁকা মাঠে একা-একা থাকেন ভদ্রলোক। সাহসের সত্যি তুলনা নেই ভদ্রলোকের। ছোটকাকা হাঁটতে-হাঁটতে তাঁর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

পপাই অবাক হল, "এখানে?"

ছোটকাকা বাড়ির দরজার কড়াটা নাড়াতে-নাড়াতে বললেন, "আমরা একা-একা জঙ্গলে ঢুকব কী করে? রাস্তা চিনি না তো!"

সৌমিতা বলল, "উনি এই রাতে যেতে রাজি হবেন আমাদের সঙ্গে?"

ছোটকাকা বললেন, "দেখা যাক।"

আরও প্রায় আধমিনিট দরজার কড়া নাড়ার পর মাস্টারমশাইয়ের সাড়া মিলল। শুয়ে পড়েছিলেন খুব সম্ভব। পরনে লুঙ্গি। খালি গা। দরজা খুলে অবাক গলায় বললেন, "আপনারা! এখন!"

চাঁদের আলোয় মাস্টারমশাইয়ের মুখচোখ অস্পষ্ট। ঠিক তাঁর পিছনে বাড়ির কাজের লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার বিশাল একখানা বল্লম। এমনভাবে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কাউকে একটু বেচাল দেখলেই চালিয়ে দেবে অস্ত্রটা।

সৌমিতা যা ভেবেছিল ঠিক তাই। সব শুনে মাস্টারমশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "সে কী! এই যে তখন আপনারা ঠিক করলেন, টাকা দিয়ে দেবেন?"

ছোটকাকা বললেন, "পরে আমরা ডিসিশন চেঞ্জ করেছি। শেষ চেষ্টা একটা করে দেখাই যাক না! চলুন আমাদের সঙ্গে।"

"এই রাতে!" মাস্টারমশাই যেন আঁতকে উঠলেন, "এই রাতে

জঙ্গলে ঢোকে কেউ?"

"ঢোকে বইকি। আপনার ঘরের কেউ যদি জঙ্গলে এইভাবে আটকা পড়ত, আপনিও ঢুকতেন।" ছোটকাকা গম্ভীর গলায় বললেন।

"আপনি শিওর, মেয়েটি জঙ্গলেই আছে?"

"মোর দ্যান শিওর। চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

হঠাৎ পিছন থেকে সনাতন খরখর করে উঠল, "আপনারা এখান থেকে চলে যান। উনি যাবেন না।"

"কী!" ছোটকাকা থমকে গেলেন।

"আহ্ সনাতন!" মাস্টারমশাই গলা তুললেন।

সনাতন সামনে এসে দাঁড়াল। মাস্টারমশাইকে আগলে বল্লমটা বেমালুম ছোটকাকার দিকে তাক করে গলা চড়িয়ে দিল, "এই রাতে কেন ওঁকে বিরক্ত করছেন? আপনারা যান এখান থেকে।"

এই রে! এক্ষুনি একটা কাণ্ড ঘটে যাবে। এসব পরিস্থিতিতে ছোটকাকা যা খুশি তাই করে ফেলতে পারেন। সৌমিতার বুক টিপটিপ করে উঠল।

কিন্তু না। যা খুশি নয়, তার বদলে এমন একটা ঘটনা ঘটল, কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। সকলকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "ভাল্লাটা সরাও। সরাও!"

সৌমিতা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, রঘু। ছোটকাকার নিষেধ অমান্য করেই চলে এসেছে তাদের পিছুপিছু। সাধারণ মানুষ হলেও মন বলে সত্যি একটা বস্তু আছে লোকটার। রঘুর হাতের অস্ত্র দেখে সনাতন গুটিয়ে গেল। সুড়সুড় করে সরে গেল।

"স্যার, যা বলেছেন তাই করুন মাস্টারবাবু।" রঘু গম্ভীরভাবে বলল মাস্টারমশাইকে, "চলুন আমাদের সঙ্গে।"

ছোটকাকাও গলা মেলালেন তার সঙ্গে, "চলুন চলুন। বাবলির বিপদের জন্য আপনারও কিন্তু দায়িত্ব কম ছিল না মাস্টারমশাই। এখন পিছিয়ে গেলে চলবে কেন?"

"কী মুশকিল! আমি যাব না একবারও বলেছি?" মাস্টারমশাই বললেন, "রাতে না গিয়ে কাল সকালে গেলেই তো হয়! আজ আবার হাতিও বেরিয়েছে কানে এল যেন!"

"না, হয় না। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই মাস্টারমশাই।"

"ঠিক আছে। এক মিনিট দাঁড়ান, আমি চেঞ্জ করে আসি।"

মাস্টারমশাই চলে গেলেন ভিতরে। রঘু এগিয়ে এল ছোটকাকার কাছে। অনুতপ্ত গলায় বলল, "আমাকে মাপ করবেন স্যার। আমি থাকতে পারলাম না।"

ছোটকাকা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে শুধু বললেন, "ঠিক আছে!"

হুঁ, ছোটকাকা বেশ চটে গিয়েছেন। পরে এর জন্য রঘুকে ভুগতে হবে। পরনের লুঙ্গিটা ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট আর পায়ে ভারী গামবুট গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন মাস্টারমশাই। বললেন, "বলুন, কোন দিকটায় যাবেন?"

"আগে তো ঢুকি জঙ্গলে, তারপর দেখা যাবে।"

মাস্টারমশাই "বেশ," বলে বড়-বড় পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে জঙ্গলের রাস্তাটা ধরে ফেললেন। এই পথেই আজ সকালে বাবলিকে নিয়ে নরেশ সিংহ উধাও হয়ে গিয়েছে। দূরে চাঁদের আলো মেখে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল পাহাড়। জঙ্গল তার তলায়-তলায় বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের উপরেও বিশাল জঙ্গল। চলে গিয়েছে সেই হাজারিবাগ শহর পর্যন্ত। দেখতে-দেখতে খেত, মাঠ শেষ হয়ে গেল। ওরা ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। ঢুকতেই অদ্ভুত কাণ্ড।

আলো ঝলমল সিনেমা হলের আলো ঝপ করে নিভে গেল যেন। কানের কাছে ঝিঁঝিপোকা আর পোকামাকড়ের চিৎকার শুরু হয়ে গেল। কটকট করে কাছাকাছি কী যেন একটা ডেকে-ডেকে উঠছিল। থতমত খেয়ে সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সৌমিতা ঘুরল ছোটকাকার দিকে, "টর্চটা দাও না ছোটকা!"

ছোটকাকা বললেন, "না, টর্চ বেশি জ্বালানো যাবে না। নরেশ সিংহের চোখে পড়ে গেলে সর্বনাশ।"

মাস্টারমশাই গজগজ করে উঠলেন, "পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। নরেশ সিংহের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ছিল ডাকাত, হয়েছে অস্ত্রের কারবারি। আপনারা না এলে আমিও জানতে পারতাম না। মরবে, ব্যাটা নির্ঘাত মরবে।"

কিছু দূর যাওয়ার পর জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে চাঁদের আলো এসে পড়ছিল। এক-একটা জায়গা এমন মাঠমতো হয়ে আছে, বোঝাই যায় সেখানে বড়-বড় গাছ ছিল, খিদের জ্বালায় কেটে সাফ করে দিয়েছে এখানকার অধিবাসীরা। সৌমিতার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। গরিব, হতভাগা মানুষগুলোর উপর রাগও করতে পারছিল না। তারাই বা কী করবে? জঙ্গল না কাটলে স্রেফ না খেয়ে মারা পড়বে। ক'দিন আগে এমন ঘটনা তো এ-রাজ্যেই ঘটেছে।

"বলুন, এবার কোন দিকে যাবেন?" মাস্টারমশাই ঘুরলেন ছোটকাকার দিকে।

ছোটকাকা বললেন, "সেটা তো আপনি বলবেন। জঙ্গলের কোথায় কী আছে, আপনার চেয়ে ভাল আর কে জানে? আপনি তো ছেলেবেলা থেকেই আপনার বাবার সঙ্গে এসব জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন।"

সৌমিতার হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাস্টারমশাইয়ের বাবার শিকারবাড়ির কথা। সেটা নিশ্চয়ই জঙ্গলের একেবারে ভিতরের দিকেই হবে। বলা যায় না, নরেশ সিংহ হয়তো তার ভিতরেই বাবলিকে গুম করে রেখেছে। ওখানে একবার হানা দিলে হয় না?

কথাটা সে বলতেই পপাই হইহই করে উঠল, "ঠিক বলেছিস মিতা। ঠিক, ঠিক।"

ছোটকাকাও মাথা নেড়ে বললেন, "কথাটা খারাপ বলিসনি মিতা। আপনি কী বলেন মাস্টারমশাই?"

"শিকারবাড়ি, অ্যাঁ? ভাল নাম বের করেছ!" মাস্টারমশাই হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলেন। বললেন, "ও আর আছে না কি?"

সৌমিতা বলে উঠল, "নেই? আপনি যে বলছিলেন!"

মাস্টারমশাই হাসতেই থাকলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "ও থাকা আর না থাকা একই। হাঁটতে হবে কিন্তু। অনেকটা রাস্তা।"

তাতে অবশ্য কারও আপত্তি দেখা গেল না। সৃষ্টিছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের মেম্বারদের আর যা-ই হোক, হেঁটে ঘায়েল করা যায় না। ছোটকাকা বললেন, "যে হাঁটতে জানে না, তার চেয়ে বড় দুর্ভাগা আর কেউ নেই।" চারপাশটা নিখুঁতভাবে জানতে হলে, চিনতে হলে, হাঁটা ছাড়া পথ নেই। খুব শিগ্‌গির ছোটকাকার হেঁটে ভারতভ্রমণের একটা পরিকল্পনা আছে। আনন্দের সঙ্গে সকলে হাঁটতে শুরু করল।

এই দিকটায় জঙ্গল কম, পায়েচলা সরু পথ চলে গিয়েছে এঁকেবেঁকে। রাস্তা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বড় গাড়ি না ঢুকলেও, রেগুলার দু' চাকা চলাচল করে এই পথে। আধ ঘণ্টা একটানা হাঁটার পর হঠাৎ এগিয়ে এল রঘু। সে চারদিক নজর রাখতে-রাখতে একটু দূর থেকে তাঁদের অনুসরণ করছিল।

গুন্ডা-বদমাশের চেয়ে বেশি ভয় তার হাতিকে। এই পথে যখন-তখন হাতির পাল নেমে আসে। দলছুট হাতিটা এসে পড়াও আশ্চর্য নয়।

"ও মাস্টারবাবু, কোথায় যাচ্ছেন আপনি!" রঘু গলা তুলল, "এ তো পাকা সড়কের রাস্তা। আর-একটু গেলেই জঙ্গল শেষ।"

মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে সৌমিতারাও। চারপাশটা একটু ভাল করে তাকিয়ে দেখে মাস্টারমশাই জিভ দিয়ে আপশোসের শব্দ করলেন, "আরে, তাই তো! ভুলে-ভুলে এ কোথায় চলে এলাম! রাতে ভাল করে চোখেও দেখি না ছাই!"

"আপনি ঠিক কোথায় যেতে চান বলুন তো?" রঘু জানতে চাইল।

মাস্টারমশাই জায়গাটার বর্ণনা দিলেন। রঘু মাথা নেড়ে বলল, "সে এখানে কোথায়? ও তো সাত নম্বর বিটে। ঝিল তো? তার পাড়ে একটা ছোট ঘর, অ্যাঁ?"

"আছে, আছে? এখনও আছে?" পপাই চেঁচিয়ে উঠল।

রঘু মাথা নেড়ে জানাল, যে ছ' মাস সে ডি এফ ও'র অফিসে বদলি হয়েছে, তার আগে সে এই জঙ্গলেই পোস্টিং ছিল। তখন ডিউটি দেওয়ার সময় সে ঘরটাকে দেখেছে। হুঁ, ঘরটা শিকারিদের তৈরি বলেই সে জানত। সেই শিকারি যে এই মাস্টারবাবুর বাবা, সেটা জানত না।

ছোটকাকা এতক্ষণ রাগের বশে একটাও কথা বলেননি রঘুর সঙ্গে। এবার আর কথা না বলে পারলেন না, "আপনি এই জঙ্গলে ছিলেন আগে বলবেন তো! আপনি আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবেন?"

"এক্ষুনি।" ছোটকাকা কথা বলায় খুশিতে ডগমগ হয়ে সে উত্তর দিল।

"চলুন।"

আবার শুরু হল হাঁটা। এবার অন্য পথে। পায়ে-পায়ে তৈরি পথই, কিন্তু বেশ চওড়া। জিপ বা ছোটখাটো লরি ঢুকে যাবে। রঘুর কাছ থেকে জানা গেল বনের এটাই মেন রোড। সারা বন গোল হয়ে ঘুরে গিয়েছে। বনরক্ষীরা গাড়ি নিয়ে এটা ধরেই টহল

দিয়ে বেড়ায়। তার জন্যই এদিকটায় গাছপালা কাটা পড়লেও, তত নয়। নতুন করে লাগানো গাছও নজরে পড়ছিল। এক- একটা জায়গায় এমন ঘোর হয়ে আসছিল, রাস্তা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না, টর্চ জ্বালতে হচ্ছিল। হঠাৎ পাশের ঝোপঝাড়ে ঝড় তুলে হুড়মুড় করে কী একটা প্রাণী তিরবেগে ছুটে পালাল। এমন আচমকা ব্যাপারটা ঘটে গেল, ভয়ে বুক কেঁপে উঠল সৌমিতার।

পপাই চেপে ধরল ছোটকাকার জামা, "কী ওটা?"

ছোটকাকা বিরক্ত হলেন, "এই সাহস নিয়ে তোরা নরেশ সিংহের মতো লোকজনের মোকাবিলা করবি? ও কিছু নয়, হায়না!"

বন যত ঘন হয়ে আসছিল, তত নানারকম আওয়াজ বাড়ছিল। রাতচরা পাখি, ঝিঁঝিপোকা, নানারকম পোকামাকড়ের ডাক তো ছিলই, তার সঙ্গে পাতা খসার শব্দ, গাছের ডালে

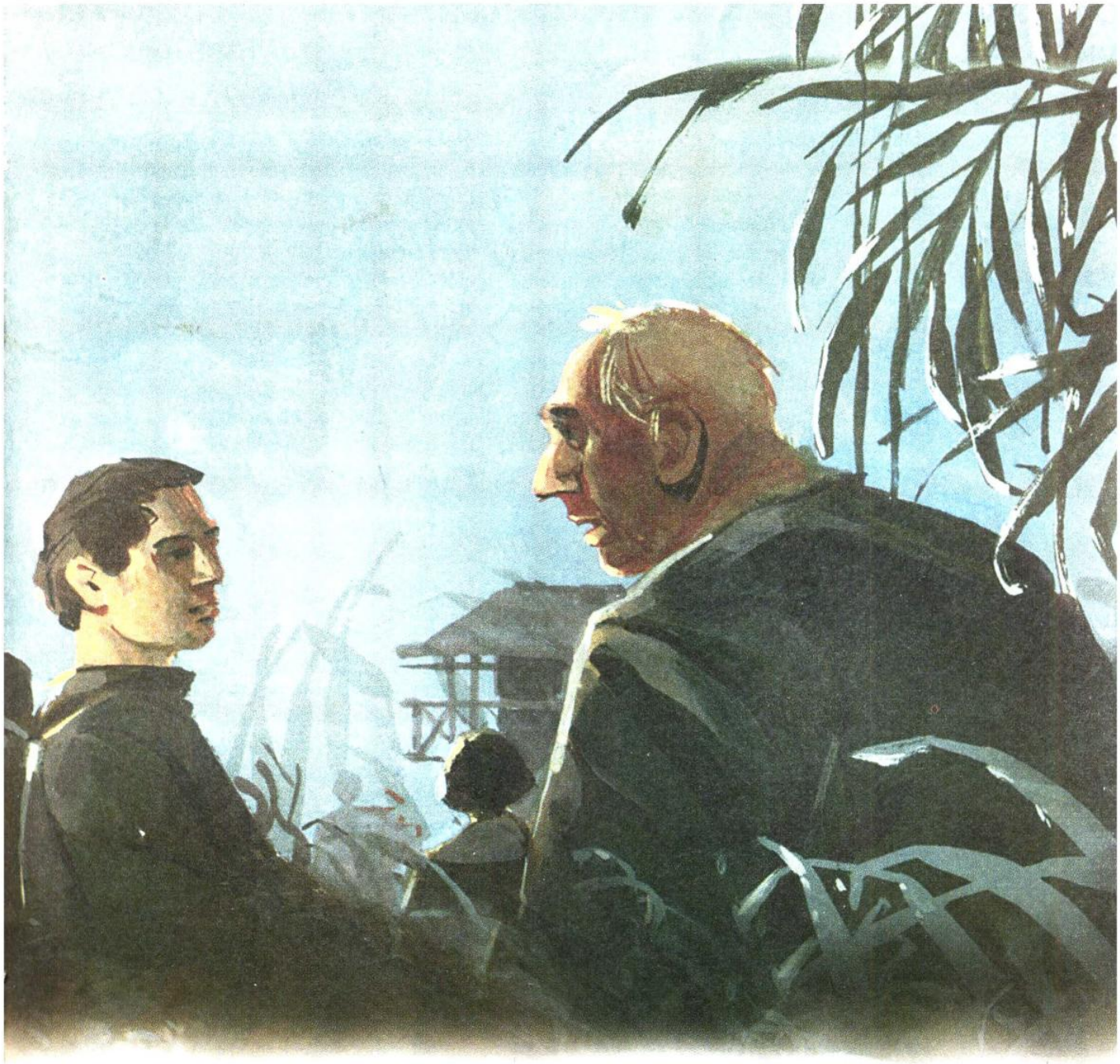

পাখিদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজও মিলেমিশে যাচ্ছিল। সৌমিতার আপশোস হল। একটা যদি টেপ রেকর্ডার থাকত সঙ্গে।

"একটু দাঁড়াও ছোটকা!" হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল পপাই।

"কী রে?" ছোটকাকা থামলেন।

"শুনতে পাচ্ছ? খুবই ফেন্ট, কী ডাকছে বলো তো ওটা?"

ছোটকাকা কান পাতলেন। সৌমিতাও শোনার চেষ্টা করল শব্দটা। বেশ একটা মোটা গলার ছড়ানো আওয়াজ। কিছুটা বিরতি দিয়ে ডেকে-ডেকে উঠছে। ভারী অদ্ভুত শব্দটা। ছোটকাকা মনোযোগ দিয়ে কিছুটা সময় নিয়ে শুনেও ঠিক বলতে পারলেন না কিসের ডাক। তবে রঘু এক কথাতেই বলে দিল, "ও তো প্যাঁচা। হুতোম প্যাঁচা।"

"হুতোম প্যাঁচা? এক্সেলেন্ট!" পপাই খুশিতে ডগমগ হয়ে গেল।

ছোটকাকাও দারুণ অনুপ্রেরণা পেয়ে গেলেন। বললেন, "এই দ্যাখ, ঘর ছেড়ে বাইরে বেরনোর ফল। বই পড়ে কি তোরা জানতে পারতিস হুতোম প্যাঁচা কেমন করে ডাকে?"

"ঠিক বলেছেন। ভ্রমণের মতো বড় শিক্ষক আর পৃথিবীতে নেই।" ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে মাস্টারমশাই ঘুরে গেলেন সৌমিতার দিকে, "তোমরা শ্যাওড়া গাছ দেখেছ?"

"শ্যাওড়া! যে গাছে পেত্নি থাকে?" সৌমিতা বলল।

"ভূতও থাকে।" বলে মাস্টারমশাই কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছের দিকে আঙুল তুলে দিলেন, "ওই যে।"

সৌমিতা তাকাল। গাছটা মাথায় খুব উঁচু নয়। তবে বেশ ঝুপসি মতো। পাতাগুলো কেমন ঠিক বোঝা না গেলেও ডালপালার গড়ন ঠিক সাধারণ গাছের মতো নয়। সৌমিতা কাছে

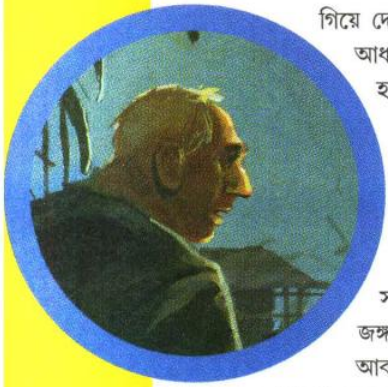

গিয়ে দেখার চেষ্টা করল, যদি পেত্‌নিটেত্‌নি এক-আধটা পাওয়া যায়। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হল, কিচ্ছু নেই।

ছোটকাকা বললেন, "এ জায়গাটায় অনেক রকম গাছপালা আছে দেখছি।"

মাস্টারমশাই বললেন, "হুঁ, লালতটির জঙ্গলের এটাই সেন্টার-প্লেস বলতে পারেন। গ্রামের লোকজন এতটা ভিতরে সাধারণত ঢোকে না। তবে দিনে-দিনে জঙ্গলের যা হাল হচ্ছে, এবার ঢুকল বলে।"

আবার হাঁটা শুরু হয়ে গেল। চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে গিয়েছে। সাইজেও অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে। এ দিকটায় গাছপালা বেশি বলে জ্যোৎস্না ঠিক খুলছিল না। সাপখোপের কথা ভেবে মাঝে-মাঝেই টর্চ জ্বালতে হচ্ছিল। আরও মিনিট পনেরো হাঁটার পর মাস্টারমশাই হঠাৎ ধপ করে বসে পড়লেন মাটিতে। আর তিনি পারছেন না। পা ভেঙে পড়ছে তাঁর।

ছোটকাকা বললেন, "ঠিক আছে। একটু রেস্ট নিয়ে নিন।"

মাস্টারমশাই দু' পা ছড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে। বললেন, "আমার দম শেষ। আপনারা এগোন, আমি এখানেই আছি।"

ছোটকাকা ডেকে নিলেন রঘুকে। জানতে চাইলেন, আর কতটা রাস্তা আছে? উত্তরে রঘু জানাল, তারা এসেই পড়েছে। সামনেই শিকারবাড়ি। ঠিক হল, রঘুকে নিয়ে শিকারবাড়িটা দেখে আসা যাক। বাবলি ওখানে সত্যি-সত্যি আটকা আছে কি না সেটা আগে শিওর হতে হবে।

"ঠিক আছে, যান। তাড়াতাড়ি ফিরবেন।" মাস্টারমশাই বললেন।

আবার শুরু হল হাঁটা। কিন্তু এবার কিছু দূর যেতে না-যেতে চারপাশটা কেমন ঘোর-ঘোর হয়ে এল। পাতলা মেঘে ঢেকে গিয়েছে চাঁদের মুখ। মেঘ আর আসার সময় পেল না! সৌমিতার মন খারাপ হয়ে গেল। ঠিক তখনই হঠাৎ সামনে থেকে ম্যাজিকের মতো গাছপালা সরে গেল, চোখের সামনে জেগে উঠল ঝিল।

মজে যেতে-যেতেও ঝিলটা এখনও যা আছে, নেহাত খারাপ না। ঝিলের ঠিক উলটো দিকে ঝাপসা চাঁদের আলোয় শিকারবাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। বাড়ি না বলে বড়সড় একটা ঘর বললেই ভাল। মাথার দিকের পোর্শন ভেঙে পড়েছে। সৌমিতার বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। বাবলি কি ওর মধ্যে আছে! সে পা বাড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে ছোটকাকা হাত ধরে সৌমিতাকে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে উঠলেন, "বেশি সামনে যাস না।"

কেটে গেল কয়েক সেকেন্ড। পপাই ঠেলল সৌমিতাকে, "মিতা দেখতে পাচ্ছিস? সেই মোটরবাইকটা।"

"কোথায়," বলে চোখটা একটু ঘোরাতেই সৌমিতার নজর গেল, শিকারবাড়ি থেকে একটু দূরে একটা মোটরসাইকেল দাঁড় করানো আছে। কোনও সন্দেহ নেই, এই গাড়িটা করেই নরেশ সিংহ বাবলিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আনন্দে বুক কেঁপে উঠল সৌমিতার। সে ঠিকই গেস করেছিল। এবার মাথা খাটিয়ে শুধু স্থির করার পালা, কীভাবে বাবলিকে উদ্ধার করা যায়।

ছোটকাকা রঘুকে পাঠিয়ে দিলেন মাস্টারমশাইকে ডেকে আনতে। তারপর সৌমিতাদের নিয়ে বসে পড়লেন। নিচু গলায় আলোচনা শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে। বাবলি ছাড়াও ওখানে ঠিক কতজন থাকতে পারে তার একটা অনুমান করার চেষ্টা করছিল তারা। ওদের সঙ্গে অতি অবশ্যই অস্ত্র আছে। তারই বা মোকাবিলা কীভাবে হবে, সেটাও তারা ভাবনাচিন্তার মধ্যে রাখছিল। আলোচনা যখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, ঘটে গেল আশ্চর্য একটা ঘটনা।

মুখ থেকে বিরক্তিকর মেঘের আড়াল ঘুচে গেল চাঁদের। সঙ্গে-সঙ্গে ঝিলের জলে গোটা চাঁদটা যেন চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। রইল পড়ে আলোচনা, রইল পড়ে বাবলি, সৌমিতা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল ঝিলের দিকে। দেখতে-দেখতে তার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা কল্পনা জেগে উঠছিল। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল মাস্টারমশাইয়ের বাবাকে। শিকারঘরের ভিতর এখনও তিনি হেভি রাইফেল নিয়ে ঠায় বসে আছেন। যে-কোনও সময় গুলি ছুটে আসবে। নিজের অজান্তেই চোখ দু'টো ঢেকে ফেলল সৌমিতা।

ঠিক তখনই রঘু ফিরে এল। বেশ উত্তেজিত। মাস্টারবাবু ভ্যানিশ।

॥ ৮ ॥

"সে কী!" ছোটকাকা সটান দাঁড়িয়ে গেলেন।

রঘু জানাল, যে গাছের নীচে মাস্টারবাবু বসে ছিলেন, সেখানে কেউ নেই। এমনকী, আশপাশে বেশ খানিকটা এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাঁর কোনও হদিশ পায়নি।

পপাই বলল, "নরেশ সিংহ তাঁকেও তুলে নিয়ে গেল না কি?"

ছোটকাকা বললেন, "হাতিতেও তো অ্যাটাক করতে পারে?"

সৌমিতার ততক্ষণে ঘোর কেটে গেছে। মাথা নেড়ে মত দিল, "পারে। কিন্তু হাতিতে তো আর তুলে নিয়ে যাবে না একটা জলজ্যান্ত লোককে। শুনলে তো, কোনও ট্রেসই নেই মাস্টারমশাইয়ের।"

বলতে-বলতে তার গলা বদলে গেল একদম, "ছোটকা, মাস্টারমশাই নিজেই ইচ্ছে করে গা ঢাকা দেননি তো?"

"কী!" ছোটকাকার গলা দিয়ে ছিটকে বেরোল প্রবল বিস্ময়।

"মাস্টারমশাইয়ের কিন্তু আমাদের সঙ্গে আসার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।" সৌমিতা বলল।

পপাই বলল, "আমারও। রঘুদা না থাকলে উনি কিছুতেই আমাদের এখানে নিয়ে আসতেন না।"

ছোটকাকা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "কথাটা ভাববার মতো। এত কালের চেনা জায়গা, ইচ্ছে করে কেমন আমাদের অন্য পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন! থ্যাঙ্ক ইউ মিতা, তুই আমার চোখ খুলে দিয়েছিস।"

ছোটকাকার গলার স্বর বদলে গেল, "গেট, গেট রেডি। আর-এক সেকেন্ড দেরি করলে বাবলিকে বাঁচাতে পারব না।"

ছোটকাকা চটপট রঘুকে কী নির্দেশ দিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে ঝিলের পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। পিছনে একটু তফাতে সৌমিতা আর পপাই। যেদিকে মোটরবাইকটা আছে তার উলটো দিক দিয়ে শিকারবাড়িতে পৌঁছনোর ইচ্ছে তাঁর। বেশ বড় ঝিল। পুরোটা ঘুরে ওপারে পৌঁছতে খানিকটা সময় লেগে গেল।

এটা শিকারবাড়ির পিছনের দিক। রাজ্যের ময়লা আর ঝোপঝাড়ে ভরে আছে জায়গাটা। সাপখোপ এখানে না থাকাটাই আশ্চর্য। ছোটকাকা ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে সকলকে চুপচাপ থাকতে বলে কাঁধের ঝোলা থেকে বের করে ফেললেন দড়ির গোছা। সেটা পপাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "উপরে উঠে দ্যাখ, ভিতরে বাবলি আছে না কি? যদি থাকে তা হলে দড়িটা ফেলে দে, ও ঠিক দড়ি বেয়ে উঠে আসবে।"

সৌমিতা হাত তুলল, "ছোটকা, উপরে ওঠার দরকার নেই। ওই দ্যাখো ওপাশের দেওয়ালে বিশাল একটা ফাটল।"

ছোটকাকার চোখ পড়ল। ফাটল নয়, ফুটো। সম্ভবত রাতে মাস্টারমশাইয়ের শিকারি বাবা এখান থেকে বন্দুকের নল বের করে পশু শিকার করতেন। ছোটকাকা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার ভিতরে চোখ রাখলেন।

"আছে বাবলি?" সৌমিতার গলা কেঁপে গেল।

ছোটকাকা হ্যাঁ না কিছু বললেন না। তাকিয়ে আছেন ভিতরে। সৌমিতার বুকটা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। ছোটকাকা কথা বলছেন না কেন? কী দেখছেন এত? কয়েক সেকেন্ড পরে নড়ে উঠলেন ছোটকাকা। চাপা স্বরে ডাকলেন, "বাবলি। অ্যাই বাবলি।"

আনন্দে রক্ত ছলাৎ করে উঠল সৌমিতার। ছোটকাকা আরও কয়েক বার ডাকার পর ভিতর থেকে বাবলির সাড়া এল। ভাগ্য গুণে একাই। লোকজন সব বাইরে। তার হাত আর পা দু'টোই বাঁধা। এখানে এসে কেউ শুধু পায়ের বাঁধন খুলে দিলে সে নিজেই বেরিয়ে আসতে পারবে। কথা বলতে-বলতে তার গলা চড়ে যাচ্ছিল, ছোটকাকা ব্যস্তভাবে বললেন, "চুপ চুপ! আমি যাচ্ছি ভিতরে।"

সেই রকমই হল। ছোটকাকা চলে গেলেন বাবলিকে আনতে, পপাই চারদিকে নজর রাখতে শুরু করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছোটকাকা বাবলিকে একেবারে কোলে করে নিয়ে চলে এলেন। তাকে দেখে আনন্দে চোখে জল এসে গেল সৌমিতার। পপাই কিট থেকে ছুরি বের করে বাবলির হাতের আর পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

বাবলির সমস্ত দুরন্তপনা শেষ। উত্তেজনায় আর ক্লান্তিতে থরথর করে কাঁপছিল বেচারি। ছোটকাকা ওকে সামলে নেওয়ার সময় দিয়ে বললেন, "জোর বাঁচা বেঁচেছিস। ওরা ক'জন আছে বল তো?"

বাবলি বলল, "ওই তো দু'জন। একজনের নাম ওস্তাদ, আর-একজন, যে আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল, তার নাম পাপ্পু। পাপ্পু লোকটা ভারী বদ। মাথায় চাঁটা মারছিল আর ভয় দেখাচ্ছিল আমাকে খালি-খালি।"

"ওস্তাদ? সে আবার কে?" পপাই জিজ্ঞেস করল।

"নরেশ, নরেশ সিংহ।" সৌমিতা বুঝিয়ে দিল, "পাপ্পু ওকেই 'ওস্তাদ' বলে ডাকছিল, বুঝলি না?"

সৌমিতা ঘুরে গেল বাবলির দিকে, "লোক দু'টো কোথায় গেল?"

উত্তরে বাবলি 'জানি না' বলে ঘাড় নেড়ে যা জানাল, সকলে চমকে উঠল। পাপ্পু জেগেই ছিল। ঘরের মধ্যে বসে-বসে পাহারা দিচ্ছিল বাবলিকে। নরেশ কোথায় ছিল সে জানে না। হঠাৎ একটু আগে নরেশ বাইরে থেকে ছুটে এসে পাপ্পুকে টানতে-টানতে হুড়মুড় করে কোথায় যেন চলে গেল। বাইরে সে মাস্টারমশাইয়ের গলা পাচ্ছিল।

"মাস্টারমশাই। যাঃ!" বিশ্বাস হল না পপাইয়ের।

ছোটকাকাও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তখন মুখ খুলল সৌমিতা। বলল, "অবাক হওয়ার কিছু নেই ছোটকা। মাস্টারমশাই আসলে যে নরেশ সিংহের লোক, আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল।"

"নরেশ সিংহ, অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ। প্রথম দিন থেকে তুমি লক্ষ করেছ কি না জানি না, আমাদের জঙ্গলে ঢোকানোর জন্য মাস্টারমশাই ইনসিস্ট করছিলেন। বাবলিকে নরেশ সিংহ তুলে নিয়ে যাওয়ার পর দেখলাম, ঠিক উলটো। জঙ্গলে ঢুকতে গায়ে জ্বর আসছে তাঁর। রঘুদা না থাকলে ওঁকে জঙ্গলে আনাই যেত না। আসলে কাজ হাসিল হয়ে গিয়েছে যে!"

ছোটকাকা চুপ। ভাবছেন। কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে সৌমিতার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, "এক্সেলেন্ট! তোর অ্যানালিসিস কারেক্ট। এবার বুঝেছি, কাল রাতে মাস্টারমশাইয়ের কাছে আমরা জঙ্গলে ঢুকব জেনে বাংলোর বাইরে চেলাদের নিয়ে ওত পেতে বসে ছিল নরেশ। ওদের টার্গেট ছিল, আমাদের মধ্যে কাউকে পণবন্দি করা। সম্ভবত তাতানকে। কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি আর পপাইয়ের জন্য তাদের প্ল্যান ভেস্তে যায়। মাঝখান থেকে ওদের এক চেলা প্রাণ হারায়। তার নাম বাবলু।"

"ঠিক ঠিক।" সৌমিতা আরও জুড়ল, "রাতের প্ল্যানটা বানচাল হয়ে যেতে বিকেলে তাতানকে তোলার আর-একটা চেষ্টা করেন মাস্টারমশাই। সেইমতো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য সকালে আমাদের বাংলোয় বলতে যান। কিন্তু সেখানে বাবলিকে দেখে তাঁর প্ল্যান একটু বদলে যায়। ব্যস, তারপর বাংলো থেকে ফিরেই সোজা চলে যান নরেশ ডাকাতের কাছে খবর দিতে।"

"কী ডেঞ্জারাস লোক! বলে কিনা, মোটরবাইকওলারা সব টুরিস্ট।" পপাই বলল।

উত্তরে সৌমিতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। হঠাৎ ঝিলের ওপাড়ে টর্চের আলো ছোটাছুটি করতে শুরু করল। কেউ বা কারা কাউকে খুঁজতে বেরিয়েছে। এই রকম কয়েক সেকেন্ড। আচমকা রাতের নির্জন বনজঙ্গল খানখান হয়ে গেল বন্দুকের শব্দে। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল পালটা গুলিবর্ষণের আওয়াজ। একটু আগে তারা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই দিকটায়। সৌমিতার গায়ে কাঁটা দিল।

"সকলে শুয়ে পড়! কুইক!" ছোটকাকা ঠেলা দিয়ে সকলকে শুইয়ে দিলেন।

সমানে গুলির আওয়াজ হচ্ছে। এ কে ফিফ্‌টি সিক্স, না ফর্টি সেভেন? ওখানে থাকলে এতক্ষণে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত। জলের উপরও ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে টর্চের আলো। একটা পাথরটাথরের আড়াল পেলে ভাল হত। সৌমিতা ছোটকাকার কানে-কানে বলল, "রঘুদার উপরই অ্যাটাক হয়েছে।"

ছোটকাকা বললেন, "হুঁ। আমারই দোষে লোকটার জীবন গেল। কেন যে লোকটাকে অ্যালাও করলাম আমাদের সঙ্গে!"

সৌমিতা বলল, "আসল কালপ্রিট তো মাস্টারমশাই। তিনিই পালিয়ে গিয়ে এদের খবর দিয়ে ডেকে এনেছেন। রঘুদার জন্য

খারাপ লাগছে।"

সৌমিতার এই মনের ভাব বেশিক্ষণ রইল না। ঘটে গেল এক আশ্চর্য কাণ্ড। জল থেকে ভুস করে উঠে এল রঘু। তার হাতের বন্দুক কোথায় গিয়েছে কে জানে। গায়ে-মাথায় লতাপাতা, ব্যাঙাচি, ময়লা আর দুর্গন্ধ। সেসব ঝাড়তে-ঝাড়তে সে সৌমিতাদের কাছে এসে ক্লান্তিতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

ছোটকাকা বুকে ভর করে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "গুলি লেগেছে নাকি?"

"না, জোর বেঁচেছি।" হাঁপাতে-হাঁপাতে রঘু বলল, "টর্চের আলো দেখে দু' রাউন্ড গুলি ছুড়েই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম জলে। ওরা এখনও আমাকে ঝিলের ঝোপঝাড়ের মধ্যেই খোঁজাখুঁজি করছে।"

"ভেরি গুড।" ছোটকাকা বললেন, "আপনার জন্য আমরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।"

হঠাৎ টর্চের আলো ছিটকে এল জলের অনেকখানি ভিতর পর্যন্ত। ছায়া-ছায়া দু'টি মূর্তি এসে দাঁড়াল ঝিলের তিরে। এতক্ষণে ওদের খেয়াল হয়েছে ঝিলের কথা। রোগা, লম্বা চেহারার একটা লোক জলের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করল। পাশে টর্চ হাতে বিকেলের সেই গাট্টাগোট্টা চেহারার লোকটি।

"ওরই নাম পাপ্পু," বাবলি ফিসফিস করে জানাল।

ছোটকাকা বললেন, "কেউ উঠবি না। নড়বি না একদম। ওদের টর্চের আলো আমাদের এখানে পৌঁছবে না।"

"কিন্তু গুলি তো লাগতে পারে।" সৌমিতা বলল।

ছোটকাকা বললেন, "লাগলে লাগবে। ভয় পাওয়ার কী আছে? কিসের ট্রেনিং দিলাম এতদিন তোদের?"

ছোটকাকার কথায় পপাই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, "ঠিক। মরার আগে মিছিমিছি মরে কী লাভ? শুধু আপশোস হচ্ছে, এখন যদি একটা রিভলভার থাকত!"

"থাকলে আর বাবলিকে উদ্ধার করা যেত না! মাথা গরম করে সব কাঁচিয়ে দিতিস।"

পপাই বলল, "ওই রোগা লোকটা তা হলে নরেশ সিংহ? আমি একাই তো ওকে টিপে মেরে ফেলতে পারি।"

"চুপ, চুপ!" উত্তেজনায় আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সৌমিতা, "ওই দ্যাখ!"

পপাই তাকাল। তারপর তাকিয়েই রইল। ঘটে গেল সাংঘাতিক ঘটনা একটা। এরকম ঘটনা চোখে দেখা দূরের কথা, কল্পনাও করা যায় না। নরেশ সিংয়ের ঠিক পিছনের জঙ্গল থেকে চলন্ত পাহাড়ের মতো অতিকায় এক প্রাণী বেরিয়ে এল। সন্দেহ নেই, এটাই সেই দলছুট হাতি। ড্যামের দিকে ভাঙচুর করে ফেরার পথে পেয়ে গিয়েছে এদের।

নরেশ সিংহের বন্দুক ছিটকে গেল। চোখের নিমেষে হাতি তাকে শুঁড়ে তুলে নিল। তারপর পাটায় ফেলে কাপড় কাচার মতো নরেশকে সে আছড়াতে শুরু করল মাটিতে। বিকট চিৎকার পেড়ে নরেশ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চিরদিনের মতো চুপ করে গেল। পাপ্পু প্রাণ ভয়ে তারস্বরে চিৎকার করছিল। চিৎকার করতে-করতেই লাগাল ছুট। কিন্তু হাতি তাকেও ছাড়ল না। তাড়া করে গেল। মিনিটখানেক কি তার একটু কম হবে। আর-একটা অন্তিম আর্তনাদে বন-পাহাড় ফালাফালা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে-আস্তে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল।

পপাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, "যাঃ, সব শেষ!"

ছোটকাকা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দেখাদেখি রঘু। বলল, "হাতিঠাকুরই ওদের শিক্ষা দিয়ে দিলেন।"

সৌমিতা ঘাড় নাড়াল, "হুঁ, লালতটির লোকেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সেই সঙ্গে সুসময়কাকুরাও।"

কিন্তু মাস্টারমশাই? তাঁরও কি একই পরিণতি হল? ওফ্, কী ধুরন্ধর লোক! পায়ের ব্যথার বাহানা করে তাদের সরিয়ে দিয়ে ঝিলের অন্য দিক দিয়ে ঘুরে আগেই শিকারবাড়িতে পৌঁছে যান। নরেশ সিংহ ও তার সঙ্গীকে সাবধান করে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু নরেশ সিংহ আরও বেশি সাহসী হয়ে পিছন দিক থেকে তাদেরই সবসুদ্ধ উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। ছোটকাকা ঠিকই বলেন! সাহস ভাল, বেশি সাহস নয়।

রঘু বলল, "এখন এখানে থাকা ঠিক নয়। চলুন, ঘরটার ভিতর ঢুকে পড়ি। ভোর হলে বেরনো যাবে।"

ততক্ষণে সকলে উঠে পড়েছে। বাবলি বলল, "আবার ওখানে! না না! এখনও আমার পা দু'টো টনটন করছে। কী টাইট করে বেঁধেছিল, ওফ্।"

পপাই বলল, "হুঁ, এই জায়গাটাই সেফ। ঝিল ঘুরে হাতি আর এত দূর আসবে না।"

ছোটকাকাও ঘাড় নেড়ে বললেন, "ও আর আছে না কি? কাজ সেরে চলে গিয়েছে। আর আওয়াজ পাচ্ছিস?"

না, আর কোনও আওয়াজ নেই। গাছে-গাছে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা পাখির কলরব মিলিয়ে আসছিল। আবার স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ঝিঁঝিপোকা আর পোকামাকড়ের ডাক। ঝিলের জলে কটকট করে ডেকে উঠল ব্যাঙ। খুস করে খসে পড়ল ইউক্যালিপটাসের শুকনো পাতা। মচমচ করে ঝরাপাতা মাড়িয়ে কী যেন চলে যাচ্ছে দূরে। দেখতে-দেখতে রাতের বন আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এখন কে বলবে একটু আগে এখানে এত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে! ভাবতে-ভাবতে আবার কল্পনা জেগে উঠতে থাকল সৌমিতার। সে স্পষ্ট দেখল, শিকারবাড়ির দেওয়ালের ফুটো দিয়ে বন্দুকের নল বেরিয়ে আছে। তা থেকে সরু সুতোর মতো এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে সে তলিয়ে যাচ্ছিল কোন অতলে।

॥ ৯ ॥

কতক্ষণ এমন ঘোরের মধ্যে ছিল সৌমিতা নিজেই জানে না। হঠাৎ দেখল, ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। গাছে-গাছে পাখিরা বাসা ছাড়ার জন্য ছটফট করতে আরম্ভ করেছে। বেশ একটা মন ভাল করা ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছিল। তাতে ঠান্ডা-ঠান্ডা আমেজ। আঃ, ঝিলের ওপারে নরেশ সিংহের বিশ্রী মৃতদেহটা যদি এখন পড়ে না থাকত!

"এর মধ্যে ভোর হয়ে গেল?" অবাক হয়ে গেল সৌমিতা।

এতক্ষণে হাসি ফুটল ছোটকাকার মুখে। বললেন, "হবে না? কখন থেকে ঘুরছি জঙ্গলে-জঙ্গলে। কত কী ঘটনা ঘটে গেল এক রাতের মধ্যে। ওফ্, স্মরণীয় হয়ে থাকবে!"

পপাই বলল, "একটা শব্দ পাচ্ছ? গাড়ির?"

সৌমিতা কান পাতল, "হুঁ, দূর থেকে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ

ভেসে আসছে। একটা নয়, দু'টো গাড়ি। শব্দ শুনে জিপই মনে হচ্ছে। কারা আসছে সাতসকালে জঙ্গলের ভিতর? নরেশ সিংহের দলবল নয় তো!"

ছোটকাকা সকলকে নিয়ে গাছের আড়ালে চলে গেলেন। রাতে ছিল একরকম, এখন দিনের আলোয় গোলাবন্দুক চালালে ফেস করা মুশকিল।

গাড়ির শব্দ শিকারবাড়ির কাছাকাছি এসে থেমে গেল। গাছপালার জন্য গাড়ি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শোনা যাচ্ছে কড়মড় করে ভারী জুতোর শব্দ। গলার আওয়াজ ভেসে আসছিল। সকলে দমবন্ধ করে চেয়ে রইল।

কয়েক সেকেন্ড। গাছপালা ঠেলে ঝিলের পাড়ে এসে দাঁড়াল কয়েকজন খাকি পোশাক পরা লোক। তাদের হাতে রাইফেল। নরেশ সিংহের ডেডবডিটা ঘিরে দাঁড়াল তারা। পিছনে মুখ বাড়াচ্ছিলেন ডি এফ ও সুসময়বাবু ও রেঞ্জ অফিসার লছমিকান্ত শর্মা। শর্মার হাতে মাঝারি মাপের একটা অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র।

ছোটকাকা দেরি না করে বেরিয়ে এলেন গাছের আড়াল থেকে। হাত তুলে সুসময়বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "মিস্টার নন্দী, আমরা এখানে!"

ছোটকাকার পিছন-পিছন প্রায় নাচতে-নাচতে বেরিয়ে এল পুরো অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব। ঝিলের পাড় ধরে ছুটতে শুরু করল। সকলের আগে-আগে বাবলি। আবার একটু-একটু করে তার দুরন্তপনা ফিরে আসছে।

সুসময়বাবু হাঁ করে দেখছিলেন তাদের। ছোটকাকা কাছে আসতেই বাবলিকে দেখিয়ে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "পেয়েছেন মেয়েটাকে? এই মেয়েটাই তো?"

ছোটকাকা ঘাড় নাড়লেন। সুসময়বাবু তারিফ করে উঠলেন, "আপনারা তো অসাধ্য সাধন করেছেন মশাই। সব খুলে বলুন।"

ছোটকাকা হাত নেড়ে বললেন, "বলছি, তার আগে আপনি বলুন, আপনারা এখানে?"

সুময়বাবু বললেন, "আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনার দাদা ফোন করে আমাদের জানালেন, আপনারা জঙ্গলে ঢুকেছেন! ওফ্, সারা রাত আপনাদের খোঁজে সারা জঙ্গল চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছি। কী বিপদেই আমাদের ফেলে দিয়েছিলেন!"

ছোটকাকা মাথা নাড়লেন, "দাদাকে নিয়ে পারা যায় না! আমি বারণ করেছিলাম আপনাদের ফোনটোন করতে!" বলে ধীরেসুস্থে ছোটকাকা সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

সব শুনে সুসময়বাবু তাজ্জব হয়ে গেলেন। তারিফ করে বললেন, "অকুতোসাহস মশাই আপনাদের। আমি কিনা আপনাদের জঙ্গল দেখাব বলেছিলাম। জঙ্গলের আর কিছু বাকি রেখেছেন?"

"আমাদের মাফ করবেন মিস্টার নন্দী। ইনফ্যাক্ট, আমাদের উপায় ছিল না।" বলে একটু চুপ করে থেকে ছোটকাকা অন্য কথা পাড়লেন, "যাই হোক, আপনারা পাপ্পুর বডি রিকভার করেছেন তো? নরেশের চেলা?"

"না।" নড়েচড়ে উঠলেন রেঞ্জ অফিসার লছমিকান্ত শর্মা। তাঁর হাতের অস্ত্রটা দেখিয়ে বললেন, "এই অ্যাসল্ট রাইফেলটা কি তার হাতে ছিল?"

"না, না। এটা নরেশের।" ছোটকাকার ভুরু গুটিয়ে গেল, "চলুন তো দেখি।"

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক
সম্পাদিত
(by a Group of 20 paper setters)

মাধ্যমিকের সেরা সহায়ক বই

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
Madhyamik English Sahayika
মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
মাধ্যমিক ভৌত-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক মৎস্যচাষ সহায়িকা
রায়-হালদার-সাঁতরা প্রণীত কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা পরিচয়

গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই
মাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেতে
হলে এই বইগুলির সাহায্য চাই-ই চাই

PRASA-02

প্রান্তিক
স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী

১৮, ডাঃ কার্ত্তিক বসু স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন ঃ ২৩৫০-৯৩৫১,২৩৫২-৬৭১২,
টেলিফ্যাক্স্ ঃ ২৩৫০-৯৩৫১

শুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজি। সৌমিতার আশা ছিল, কাছাকাছির মধ্যেই নরেশ সিংহের সঙ্গীর খোঁজ মিলবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! প্রায় আধ ঘণ্টা বন তোলপাড় করার পর তাকে পাওয়া গেল। ঝিলের পাড় থেকে অনেকটাই দূরে পড়ে ছিল তার ছিন্নভিন্ন দেহ। বয়স খুব বেশি হলে চল্লিশ। হাঁড়ির মতো বিশাল মাথা, মোটা-মোটা হাত-পা। হাতির আক্রোশ যেন তার উপরই বেশি। একেবারে খণ্ড-খণ্ড করে ফেলেছে তাকে।

সৌমিতা তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নিল ছোটকাকার দিকে, "কিন্তু মাস্টারমশাই? তিনি কোথায় গেলেন?"

কেউ কিছু বলতে পারল না। রঘু অন্য রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের খোঁজে আরও ভিতরে ঢুকে গেল। পপাইও গেল তাদের সঙ্গে। অদম্য এনার্জি তার। বাবলি ঘাসের মধ্যে ফড়িং ধরছিল। থেমে গেল। মাথা নেড়ে বলল, "মাস্টারমশাই স্কুলে চলে গিয়েছেন।"

সৌমিতা হেসে ফেলল। ঠিক তখনই অনেক দূরে গাছপালার আড়াল থেকে পপাইয়ের চিৎকার ভেসে এল, "ছোটকা, মিতা, শিগ্‌গির দেখে যাও, কী কাণ্ড!"

সকলে তাড়াতাড়ি ছুটল। এদিকটা ঠাসা গাছপালা, প্রচুর ঝোপঝাড়। দু' হাত দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে পথ করে নিতে হচ্ছিল। কাঁটায় জামাকাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। প্রায় পাঁচ মিনিট লেগে গেল পপাইদের কাছাকাছি পৌঁছতে। পপাইরা দল বেঁধে একটা ঝাঁকড়া মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। ঘাড় উঁচু করে চেয়ে আছে উপরে।

"কী।" সৌমিতা ছুটে গেল।

"মাস্টারমশাই।"

সৌমিতার চোখ পড়ল। গাছের একদম উঁচুতে দু' হাতে একটা বড় ডাল আঁকড়ে বসে আছেন মাস্টারমশাই। এখনও কাঁপছেন থরথর করে।

সৌমিতা চেঁচাল, "নেমে আসুন মাস্টারমশাই।"

মাস্টারমশাই কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "হাতিঠাকুর চলে গিয়েছেন?"

সৌমিতা হাসি চাপতে পারল না। বলল, "অনেকক্ষণ।"

মাস্টারমশাই নেমে এলেন। সারা শরীর তাঁর কেটেকুটে একশা। রক্ত জমে লাল হয়ে গিয়েছে জায়গায়-জায়গায়। কাঁটাঝোপের কীর্তি।

"বেইমান, বিশ্বাসঘাতক। নরেশ সিংহের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন?" রঘু বাঘের মতো তেড়ে গেল তাঁর দিকে, "দেখি এখন কে বাঁচায়!"

মাস্টারমশাই চিৎকার করে বসে পড়লেন মাটিতে। ভয়ে-আতঙ্কে দু' হাত জোড় করে ফেললেন। কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "আমায় মেরো না। আমার কোনও দোষ নেই। বিশ্বাস করো।"

"আপনাকে বিশ্বাস করেই তো আমরা মরতে বসেছিলাম।" পপাই চেঁচিয়ে উঠল, "নরেশ সিংহকে দিয়ে আমাদের সকলকে খতম করার প্ল্যান করেছিলেন, অ্যাঁ?"

"না, না। আমি শুধু ওকে সাবধান করে দিতে গিয়েছিলাম। ওকে বলেছিলাম, পালিয়ে যেতে। আগের দিন রাতেই বাংলোয় হানা দিতে গিয়ে সে তার পুরনো চেলা বাবলুকে হারিয়েছে। এমনিতেই প্রচণ্ড খেপে ছিল সে। আমার কোনও কথাই শুনল না।"

বলতে-বলতে মাস্টারমশাই ছোটকাকার দিকে চেয়ে ভেঙে পড়লেন, "বিশ্বাস করুন, আমার কোনও দোষ নেই। আমার উপায় ছিল না। আমি সব খুলে বলছি আপনাদের।"

"আবার মিথ্যে কথা!" রঘু হাত ওঠাল।

ছোটকাকা রঘুকে সরিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন, "কী কথা?"

"বলছি-বলছি। একটু জল।" মাস্টারমশাই হাঁ করলেন।

ছোটকাকা কাঁধের কিট থেকে ওয়াটার বট্‌ল বের করলেন। সামান্যই জল পড়ে ছিল। মাস্টারমশাইয়ের তখন উঠে বসবারও সামর্থ্য নেই। বসে-বসে সেটুকুই এক ঢোকে গলায় চালান করে আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে সব কথা খুলে বললেন। সত্যিই ভয়ংকর ঘটনা। ফাঁকা মাঠে একা-একা বাস মাস্টারমশাইয়ের। তারই সুযোগ নিয়েছিল নরেশ সিংহ। মাস্টারমশাইকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে তাঁকে বাধ্য করেছিল অস্ত্র কেনাবেচার এজেন্ট হতে।

মাস্টারমশাই ছাড়াও অমল বলে একজন ছিল লালতটিতে নরেশ সিংহের এজেন্ট। রাত গভীরে তাদের কাছে লোক আসত অস্ত্র কিনতে। মাস দু'য়েক আগে অমলের পরিচিত একজন তার কাছে আসে রিভলভারের সন্ধানে। রিভলভারটা নিয়ে সে জানিয়ে যায়, দু' দিন পরে দাম দেবে। বেআইনি অস্ত্র কেনাবেচার ক্ষেত্রে টাকার লেনদেন সব সময় যে হাতে-হাতে হয়, তা নয়। কিন্তু লোকটা সেই যে যায়, তার পর তল্লাট থেকে উধাও হয়ে যায়। নরেশ সিংহ কয়েকবার করে তাগদায় এসে টাকা উদ্ধার করতে না পেরে একদিন অমলের বাড়ি ঢুকে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। এমনই মাথা গরম নরেশের।

মাস্টারমশাই থামতে ছোটকাকা সুসময়বাবুর দিকে ফিরলেন, "এই কেসটার কথাই আপনি বলছিলেন না?"

"রাইট।" সুসময়বাবু মাথা নাড়ালেন।

মাস্টারমশাই একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, "আমার ক্ষেত্রেও মাসখানেক হল এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। ড্যামের যে গেস্টহাউস, তার সিকিউরিটি রতনের মারফত দু'টো দামি অ্যাসল্ট রাইফেল বেরিয়ে যায় আমার হাত থেকে। রতন এর আগেও অস্ত্র কিনেছে আমার কাছে। নেপালে তার বড়-বড় পার্টি আছে। আমার কাছ থেকে রেগুলার মাল নিয়ে সে বেরিয়ে যায় দু'-চার মাস ছাড়া-ছাড়া। পেমেন্টে কখনও ভুগতে হয়নি তাকে নিয়ে। কিন্তু এবার হল। নেপাল যাওয়ার পথে পুলিশের তাড়ায় গুলি খেয়ে মরল সে।

"নরেশ টাকার তাগাদায় এসে আমার কাছে সব শুনে প্রচণ্ড খেপে যায়। আমি সেদিন অনেক কষ্টে তার হাতেপায়ে ধরে আরও একটা মাস সময় চেয়ে নিই। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ডিল। ভেবেছিলাম, জমিজমা যা আছে বেচেবুচে নরেশকে টাকা মিটিয়ে দেব। ঠিক তখনই আপনারা বেড়াতে এলেন এখানে।"

মাস্টারমশাই থামলেন। সৌমিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমাদের দেখে আপনার মাথায় প্ল্যান খেলে গেল, পণবন্দি করে টাকা আদায়ের। এখন তো এ জিনিসটা খুব চলছে। ঠিক?"

মাস্টারমশাই সৌমিতার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলেন

না। "হুঁ।" বলে মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে বললেন, "এতে বকেয়া টাকা তো উদ্ধার হবেই, আরও বাড়তি কিছু আমদানি হতে পারে বুঝে নরেশ সিংহ নেচে উঠল। সেটাই কাল হল তার।"

"সেই সঙ্গে আপনারও।" সুসময়বাবু এগিয়ে গিয়ে মাস্টারমশাইয়ের হাত ধরে টানলেন, "উঠুন! চলুন আমাদের সঙ্গে। সারাজীবন জেলে পচে মরুন। ছি ছি, আপনি শিক্ষক!"

মাস্টারমশাই উঠলেন না। চেয়ে রইলেন সুসময়বাবুর দিকে। দেখতে-দেখতে তাঁর চোখ দু'টো ভারী হয়ে এল। বললেন, "অমন করে বলবেন না নন্দীসাহেব। আমার এক ছেলে ছিল, সে মারা গিয়েছে। স্ত্রী ছিলেন, তিনিও মারা গেলেন গত বছর। আমি একদম একা হয়ে গিয়েছি স্যার। একটা বুড়ো কাজের লোক ছাড়া আমার পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। নরেশ সিংহের মতো লোকজনের সঙ্গে আমরা পারি?"

সুসময়বাবু থতমত খেয়ে হাত ছেড়ে দিলেন মাস্টারমশাইয়ের। ছোটকাকা কঠিন গলায় বলে উঠলেন, "তা পারেন না। কিন্তু একটা জিনিস আপনি করতে পারতেন, মরতে। নরেশ সিংহের সঙ্গে হাত মেলাবার আগে মরে যাওয়াই উচিত ছিল আপনার।"

পপাই গলা মেলাল, "হ্যাঁ, এখনও প্রাণের মায়া আপনার!"

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। মাস্টারমশাই লাফ দিয়ে দু' পায়ের উপর খাড়া হয়ে গেলেন। পপাইয়ের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "প্রাণের মায়া তোমার নেই। খোলা রিভলভারের সামনে দাঁড়িয়েছ কখনও? বেশি বড়-বড় কথা বোলো না ছোকরা!"

"কী বললেন? কী!" পপাই রুখে উঠল।

পপাইকে সরিয়ে দেওয়া হল। তার পর সকলে মিলে মাস্টারমশাইকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল জিপের দিকে। মাস্টারমশাই তখনও রাগে ফুঁসছেন। পারলে পপাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই রকম কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে-আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেলেন। জিপের কাছে এসে পৌঁছতেই কাঁধ ঝুলে গেল তাঁর। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছোটকাকাকে বললেন, "আই অ্যাম সরি।"

ছোটকাকা কাঁধ ঝাঁকালেন, "সরি বললে কী এত সহজে পার পাবেন আপনি? কোথায় আছে আর্মসগুলো? বলুন! জঙ্গলের কোথায় আপনাদের ঠেক?"

মাস্টারমশাই বললেন, "জঙ্গলে নয়, ওগুলো আছে আমার বাড়িতেই।"

"স্ট্রেঞ্জ!" সুসময়বাবু অবাক হয়ে গেলেন।

সৌমিতা বলল, "আশ্চর্য হওয়ার কী আছে কাকু? ওটাই তো সবচেয়ে সেফ জায়গা। আপনাদের সন্দেহ হবে না। তা ছাড়া জঙ্গলে আর্মসগুলো থাকলে আপনারা এত দিনে ঠিক বের করে ফেলতেন।"

চোখ গোল হয়ে গেল সুসময়বাবুর। তারিফ করে উঠলেন, "এ মেয়ে তো দারুণ ইন্টেলিজেন্ট!"

"হায় হায়, এ-ও আমার কপালে ছিল।" মাস্টারমশাই ভেঙে পড়লেন। কপাল চাপড়াতে-চাপড়াতে ছোটকাকার দিকে চেয়ে বললেন, "এখন আমার মনে হচ্ছে, আপনি ঠিকই বলেছেন। মরে যাওয়াই উচিত ছিল আমার। কিন্তু পারিনি। কেন পারিনি!"

মাস্টারমশাই জিপের লোহার উপর নিষ্ঠুরভাবে মাথা ঠুকতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে সরিয়ে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল জিপে। জিপে উঠে মাস্টারমশাই দু' হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন মুখ। তারপর কাঁদতে শুরু করলেন। ফুলে-ফুলে উঠে কাঁদছিলেন তিনি। একেবারে ছেলেমানুষের মতো। দেখে মনটা একটু খারাপই হয়ে যাচ্ছিল সৌমিতার।

জিপ স্টার্ট নিল। আগের জিপে মাস্টারমশাই। পরের জিপে সৌমিতারা। ডান পাশে বাঁ পাশে সরে-সরে যাচ্ছে বন। জিপের ক্যানভাসের উপর ফটাস-ফটাস করে গাছের ডালপাতা এসে লাগছে। ভাল কাজ করার জন্য জঙ্গল যেন পিঠ চাপড়ে তাদের শাবাশ জানাচ্ছে। কানের উপর ফরফর করছে ভোরের পবিত্র বাতাস, না বনের দুত? তাদের কানে-কানে যেন বলছে, বিদায় সৌমিতা, বিদায় অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব। গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে বিন্দু-বিন্দু শিশির। ওগুলো শিশির, বনের চোখের জল? তারা চলে যাচ্ছে বলে বন কাঁদছে? নাকি, ওগুলো মাস্টারমশাইয়ের অনুশোচনার অশ্রুবিন্দু?

সৌমিতার বুকটা মুচড়ে উঠল। সে আস্তে-আস্তে ঘুরে গেল ছোটকাকার দিকে। ছোটকাকার মুখে মিটিমিটি হাসি। ওফ্, এতক্ষণে ছোটকাকা হাসছেন। পপাইয়ের মুখও হাসি-হাসি। কিন্তু বাবলির মুখ গম্ভীর।

"কী রে বাবলি? চলে যাচ্ছি বলে মন কেমন করছে?" সৌমিতা বলল, "ঘাবড়াচ্ছিস কেন, আবার হবে আমাদের অ্যাডভেঞ্চার।"

পপাই ঠাট্টা করল, "আবার তোকে কেউ চুরি করে পালাবে, আমাদের আবার বেরোতে হবে তোকে উদ্ধার করতে।"

"বাবলি, তুই পুরো নাম ডুবিয়ে দিয়েছিস আমাদের।" ছোটকাকার মুখ থেকে হাসি মুছে গেল, "একটা লোক তোকে তুলে নিয়ে চলে গেল, আর তুই চেয়ে-চেয়ে দেখলি, অ্যাঁ?"

বাবলি কলকল করে উঠল, "বা রে, আমি কী করব, ওদের হাতে যে বন্দুক ছিল?"

"তর্ক করিস না।" ছোটকাকা বললেন, "ওদের হাতে নয় রিভলভার ছিল, কিন্তু তোর মনে সাহস ছিল না? একটা ফাইট দিতে পারলি না? এমনিতে তো কথার ঝুড়ি, হাত-পা বেঁধে দিল, পড়ে রইলি মুখ বুজে? তোর সঙ্গে তাতানের কোনও পার্থক্য নেই। আর কবে তোরা পারমানেন্ট হবি ক্লাবে?"

বাবলি চুপ। মুখখানা নিমপাতা খাওয়ার মতো করে বসে আছে। সৌমিতা তার পিঠ চাপড়ে দিল,

"মন খারাপ করিস না বাবলি। পরের টুরে আমাদের দেখিয়ে দিস, কেমন?" বাবলির মুখ হাসি-হাসি হয়ে এল।

গাড়ি বন ছেড়ে বেরিয়ে এল। মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশে। দূরে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। কালভার্টটা হাল্কা করে চোখে পড়ছে। তার পরে ড্যামের রাস্তা, পাহাড়ের সারি। তার মাথার উপর আকাশে ফুটে আছে বুড়ো চাঁদ। বিষণ্ণ, দুঃখিত। আজ রাতেও তো চাঁদ উঠবে। ড্যামের জলে সারারাত লুটোপুটি খাবে চাঁদ। ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে-ভাসতে তিরে এসে ভেঙে পড়বে। কেউ দেখবে না? কেউ শুনবে না?

সৌমিতা ছোটকাকার দিকে ফিরল, "ছোটকা, আমরা আজই ফিরে যাব?"

(সমাপ্ত)

নানা রঙের রামধনু

বেব্লেড দুনিয়া

বেব্লেড! শব্দটাতেই উত্তেজনা ভরপুর। এবার আর শুধু খেলনা নয়! ব্যাগ, ছোটদের ব্যবহৃত প্লাস্টিকের জিনিসপত্র, পার্টিতে যাওয়ার জিনিসপত্র থেকে পোশাক, ইনারওয়্যার সবকিছুতেই পাওয়া যাবে তাকে। ছোটদের কথা ভেবেই কার্টুন নেটওয়ার্ক এন্টারপ্রাইজ় নিয়ে এসেছে এই নতুন পাঁচটি রেঞ্জ। ভারতের ২০টি শহরে শপার্স স্টপ, প্যান্টালুন, লাইফস্টাইল, ইবনি, গ্লোবাস, লিলিপুটের মতো দোকানে পাওয়া যাবে এই সব। দামও আকাশছোঁয়া নয়। এখন শুধু পৌঁছনোর অপেক্ষা!

হ্যারির জন্মদিনে

জুলাই হল হ্যারি পটারের জন্মদিনের মাস! আর সে কথা মনে রেখেই সকলে মিলে হাজির হয়েছিল ফোরামের পাতচি শোরুমে। ১০ থেকে ১২ বছর বয়সি ছেলেমেয়েদের 'গ্রিফিন্ডর', 'র‍্যাভেনক্ল', 'ব্লিদারিন', 'হাফলপাফ' এই চারটি টিমে ভাগ করা হয়েছিল। আয়োজন করা হয়েছিল হ্যারি পটার কুইজ় প্রতিযোগিতার।

ফিরে এল বন্ধু

সিনেমার পরদায় তো বটেই, সুপারম্যান ফিরে এল খেলনার দুনিয়াতেও। একা নয়, সঙ্গে আছে আরও কিছু মজাদার খেলনা। সাড়ে পাঁচ ইঞ্চির সুপারম্যান খেলনায় থাকছে ফ্লাইট, সুপারস্ট্রেংথ, এক্সরেভিশন, সুপারব্রিথ পাওয়া যাচ্ছে ২৯৯ টাকায়। মেন্টাল টয়েজ় (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড নিয়ে এসেছে সুপারম্যান খেলনার বেশ কয়েকটি রেঞ্জ। অ্যাকশন ফিগার ক্যাটিগরিতে ২৯৯ থেকে ১,৭৯৯ টাকার মধ্যে ছ' রকমের ফিগার পাওয়া যাচ্ছে। রোল-প্লে ক্যাটিগরির দাম ৪৯৯ টাকা থেকে ১,১৯৯ টাকা। অ্যাক্সেসরিজ় আর প্লেসেট পাওয়া যাবে ১৯৯ থেকে ৭৯৯ টাকার মধ্যে।

কিশোর পৃথ্বীরাজ

স্টারপ্লাসের জনপ্রিয় সিরিয়াল 'ধরতি কা বীর যোদ্ধা পৃথ্বীরাজ চৌহান'-এ কিশোর পৃথ্বীরাজের চরিত্রে অভিনয় করছেন রজত টোকাস। শব্দভেদী বাণ চালানো থেকে জঙ্গলে বন্ধুদের সঙ্গে ডাকাতের মোকাবিলার মতো কিশোর পৃথ্বীরাজের সাহসিকতার নানা ঘটনা দেখানো হচ্ছে এই এপিসোডগুলোতে প্রতি শুক্রবার রাত ন'টায়।

ভ্রাম্যমাণ ধাঁধা

কোড সুদোকু সকলের মন জয় করার পর এবার এসেছে ট্রাভেল সুদোকু। ফানস্কুলের এই সুদোকু সেটে আছে ১০৫ রকমের যুক্তিপূর্ণ সংখ্যা বিষয়ক ধাঁধা। দাম ২৭৫ টাকা। বেড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে এবার বুদ্ধিটাকেও শাণিয়ে নেওয়া যাবে।

ছোটদের জন্য 'কিডজ়ি হাই' ও 'কিড্‌স কেয়ার'

জ়ি ইন্টারঅ্যাটিভ লার্নিং সিস্টেম লিমিটেড এবার নিয়ে এসেছে 'কিডজ়ি হাই' ও 'কিড্‌স কেয়ার'। কীরকম হবে কিডজ়ি হাই? এখানে থাকবে কিডজ়ি হাই ডে স্কুল, হাই এক্সটেন্ডেড ডে স্কুল, কিডজ়ি হাই রেসিডেন্সিয়াল উইথ উইকএন্ড। এখানে ছোটরা খেলাধুলো করবে মনের আনন্দে। শিখবে সুন্দর করে গুছিয়ে গল্প বলতে, সঙ্গে গান বাজনাও। ছোটদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেবে 'কিড্‌স কেয়ার'। পরের বছর শুরু হবে সেশন। কিডজ়ি হাই ও কিড্‌স কেয়ার নিয়ে আরও বিশদ জানার জন্য রয়েছে ওয়েবসাইট, www.kidzee.com

নতুন স্বাদ গোদরেজ জাম্পেনের নতুন স্বাদ নতুন প্যাকে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন রকম ফলের রস দিয়ে তৈরি ২০০ মিলি টেট্রা প্যাক পাওয়া যাচ্ছে ১০ টাকায়। এ ছাড়াও ২০ টাকার ৫০০ মিলি, ৩৫ টাকার এক লিটার আর ৪৫ টাকার ১.৫ লিটারের পেট বোতলও আছে।

বই

গোখরো দ্বীপের ডাকিনী *(কমিক্স)*

গল্প ও ছবি: **কৌশিক কুণ্ডু**
আনন্দ পাবলিশার্স (প্রা) লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
দাম: *৬০ টাকা*

গোয়েন্দা কমিক্সের জগতে নতুন চরিত্র সাংবাদিক নীল ও ফোটোগ্রাফার জগাদা। গল্প তাদেরই দুঃসাহসিক অভিযানের। গল্পটি স্মার্ট। আঁকাও গল্পের সঙ্গে মানাসই। কৌতুক চরিত্র জগাদা আর বাঁদর লাটুর সম্পর্ক বেশ মজার।

কেঠো পুতুল জগন্নাথ

দিগ্বিজয় দে সরকার
অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯
দাম: *৩০ টাকা*

রূপকথার গল্প হিসেবে শুরুটা বেশ ভালই লাগে। নিজের টানেই গল্পটা এগিয়ে যায়। কিন্তু তাল কেটে যায় শেষ অংশে এসে। গল্পটা অন্যরকম ভাবে শেষ হলে আরও বেশি ভাল লাগত। ছাপার ভুলের জন্যও গল্পটি পড়তে গিয়ে বারবার হোঁচট খেতে হয়।

ঝঞ্ঝাটপুরের চোর

সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়

এরকম একটা নিস্তরঙ্গ গ্রামে পোস্টিং নিয়ে আসতে হবে ভাবতেই পারেননি দুঁদে দারোগা গোরাচাঁদ সরখেল। পোস্টিং অর্ডারে থানার নাম ঝঞ্ঝাটপুর দেখে বেশ চ্যালেঞ্জিং বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু থানায় আসা ইস্তক অপরাধহীনতার বহর দেখে যথেষ্ট ম্রিয়মাণ তিনি। তাঁর মতো যোগ্য পুলিশ অফিসারকে এই থানায় একেবারেই মানায় না।

থানায় ক্রাইমচার্ট একটা আছে বটে, বহুদিন তাতে কোনও এন্ট্রি হয় না। তার মানে এই নয় যে, অপরাধের অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয় না থানায়। আদতে ঝঞ্ঝাটপুরে কোনও অপরাধই সংঘটিত হয় না বহুদিন। খুন, জখম, রাহাজানি তো দূরে থাক, কেউ কাউকে গলা চড়িয়ে কথাটি পর্যন্ত বলে না।

ছোটরা বড়দের সমীহ করে, আর বড়রাও ছোটদের স্নেহ করেন আত্মীয়জ্ঞানে। কোনও সমবয়সি বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কখনও বচসা বাধে না। তর্কাতর্কি পর্যন্ত নয়। সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত মান্যতা পায়। অভিজ্ঞতার দাম দেয় সকলেই।

ঝঞ্ঝাটপুরে সকলেই কাজের জন্য সম্মান পান। কাজের ক্ষেত্রে কাউকে ছোট-বড় জ্ঞান করা হয় না। সারা গ্রামে একটা মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না,

যাঁর কোনও বদ নেশা আছে। ঝঞ্ঝাটপুরে থানা রাখার কোনও দরকার আছে বলে মনে হয় না গোরাচাঁদবাবুর। থানার কনস্টেবল, জমাদারদের অবস্থা বড়ই করুণ। না আছে দৌড়ঝাঁপ, না আছে উপরি।

প্রথম-প্রথম ঝঞ্ঝাটপুরে এসে খুবই ভাল লেগেছিল গোরাচাঁদবাবুর। এমন গ্রাম তিনি তাঁর তেত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে কোথাও দেখেননি। ঝগড়াঝাঁটি তো অনেক দূরের ব্যাপার, কেউ কারওর দিকে তাকিয়ে হাসলে পর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে নেয়, পাছে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

কিন্তু কিছুদিন থাকতে-থাকতে গ্রামটার প্রতি অবশ্য বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে তাঁর। সবচেয়ে খারাপ লাগে, থানার দারোগা হলেও তাঁকে কেউ পাত্তা দেয় না। বরং যেন কিছুটা করুণাই করে। অবশেষে চূড়ান্ত তিতিবিরক্ত গোরাচাঁদবাবু তাঁর থানার কনস্টেবল, জমাদার, এসব স্টাফদের নিয়ে গোপন আলোচনায় লিপ্ত হলেন। যে-কোনও মূল্যে থানার উপযোগিতা বোঝাতে হবে স্থানীয় মানুষকে। চাইকি থানার কনস্টেবলরাই ডাকাত সেজে হানা দেবে বাড়িতে-বাড়িতে। মস্তান সেজে তোলা তুলবে হাটেবাজারে। তারপর অভিযুক্তকে পুলিশ গিয়ে ধরে আনবে থানায়, দেবে উচিত শিক্ষা। অবশ্য গোটাটাই হবে সাজানো, গটআপ। থানার উপযোগিতা, এমনকী সম্ভ্রম ফিরিয়ে আনতে এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে গোরাচাঁদবাবুকে। থানাটাকে তো আর কীর্তনের আখড়া বানিয়ে ফেলা চলে না!

গোরাচাঁদবাবু তাঁর পরিকল্পনামাফিক দু'জন কনস্টেবল মানিক আর রতনকে মোটামুটি ঠিক করে ফেললেন। অনেক বুঝিয়েসুজিয়ে দেশাত্মপ্রেমের মতো থানা প্রেমের ভোকাল টনিক দিয়ে ওদের রাজি করালেন তিনি এমন ঘোরতর কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য। ঠিক হল, মুখে মুখোশ পরে সিভিল ড্রেসে ওরা দু'জন সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়িতে যাবে ডাকাতি করতে। বাকি ফোর্স নিয়ে থানার জিপে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকবেন গোরাচাঁদবাবুরা।

পরের দিন রাতেই শুরু হল সাজানো অপারেশন। গোরাচাঁদবাবু পইপই করে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন দায়িত্ব। তাঁর পরিকল্পনামাফিক মানিক আর রতন মুখে রুমাল বেঁধে প্লেন ড্রেসে ঢুকে গেল ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়িতে। বাড়ির সিংহদরজার অদূরে বাঁশঝোপের আড়ালে নিজের জিপ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন গোরাচাঁদবাবু অধীর উত্তেজনায়। লোকে বলে, ডাকাত পড়লে নাকি পুলিশ যথাসময়ে আসে না। কিন্তু এবার এ-যেন ডাকাত আসিবার পূর্বেই পুলিশের সদলবলে আগমন। নতুন করে ট্রানস্লেশন শেখাতে হবে, ভেবেই মনে-মনে একচোট হেসে নেন গোরাচাঁদবাবু অকুস্থলের পরোয়া না করেই। চোর-ডাকাত ধরতে চিরকালই অকুতোভয় তিনি।

না, সময় যথেষ্ট পেরিয়ে যাচ্ছে। রাত গভীর, ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়ি থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসছে না। চিন্তিত হতে শুরু করলেন গোরাচাঁদবাবু।

তবে কি রতন আর মানিক ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়ি থেকে একেবারে গায়েব হয়ে গেল নাকি? কথা তো ছিল ভিতরে গিয়ে ওরা 'ডাকাত পড়েছে, ডাকাত পড়েছে' বলে নিজেরাই বার দু'য়েক চেঁচামেচি করবে। আর বন্দুক থেকে দু' রাউন্ড ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করবে। আর সেই আওয়াজেই যেন পুলিশ এসে পড়েছে, এমনভাবে গোরাচাঁদবাবুরা এসে হাজির হয়ে গ্রেপ্তার করবেন ওদের। ডাকাত ধরার নকল খেলার শেষে পাকড়াও করে নিয়ে যাবেন ওদের মুখে রুমাল বাঁধা অবস্থাতেই। গ্রামের লোকরা জানবে দু'-দু'টো মারাত্মক ডাকাত ধরা পড়েছে। হইহই অবশ্য করতে হবে বেশ একটা। দুঁদে দারোগা গোরাচাঁদ সরখেল আর তাঁর থানার অন্য সহকর্মীদের প্রতি গ্রামের মানুষের করুণামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের ভাবটা কেটে গিয়ে রাতারাতি বেশ সম্ভ্রম জন্মাবে জনমনে।

কিন্তু কোথায় কী! ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়ি থেকে কোনও সাড়াশব্দই নেই। বিরক্তিতে ছটফট করতে থাকেন গোরাচাঁদবাবু।

প্রকৃতপক্ষে দু'জন কনস্টেবল রতন আর মানিক মুখে রুমাল বেঁধে ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়িতে ঢুকল বটে বন্দুক দেখিয়ে। কিন্তু ব্রজসুন্দরবাবু ভয় পাওয়ার বদলে ওদের হাতে আলমারির চাবি অক্লেশে তুলে দিয়ে বললেন, "নিন, যা আছে নিয়ে যান। এই সামান্য ক্যাশের জন্য বন্দুকটন্দুক ব্যবহার করবেন কেন!"

ব্রজসুন্দরবাবুর কাছে এমন ব্যবহারের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না মানিক আর রতন। হাতে আলমারির চাবি নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ব্রজসুন্দরবাবুর দিকে।

ব্রজসুন্দরবাবু বললেন, "লজ্জা কী! নিন, আলমারি খুলে নিয়ে নিন সব।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ওদের হাত থেকে চাবিটা নিয়ে নিজের হাতেই আলমারি খুলে দিলেন ব্রজসুন্দরবাবু। আলমারির ভল্ট খুলে একশো টাকার তিনটে বান্ডিল, মোট তিরিশ হাজার টাকা বের করে ওদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এই তিরিশ হাজার টাকা জমিয়ে ছিলাম মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য। আরও বেশ কিছু টাকা লাগত। যা হোক, আমার তো একটাই মেয়ে! ওর মুখ চেয়েই এই সামান্য সঞ্চয়। তা যাক, আপনাদের ঘরেও নিশ্চয়ই বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। বাবা হয়ে আমি তো বুঝতে পারছি কষ্টটা। নইলে এই শীতের রাতে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে কেনই বা আসবেন আপনারা আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে?" দীর্ঘ সংলাপ বলে অতিথি সেবার ভঙ্গিতেই তিরিশ হাজার টাকা তুলে দিলেন তিনি রতনের হাতে।

এবার আর না কেঁদে নিজেদের স্থির রাখতে পারল না নকল ডাকাতজুটি। হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে ব্রজসুন্দরবাবুর পায়ে টাকাটা সঁপে দিয়ে বলে ওঠে রতন-মানিক দু'জনেই, "এ অধম্ম আমাদের সইবে না ব্রজদা। সে অভিনয় করেও নয়।"

তখন ব্রজসুন্দরবাবুকে সব বৃত্তান্তই জানাল ওরা। ব্রজসুন্দরবাবুও দারুণ খুশি হলেন গোরাচাঁদ-দারোগার নকল মহড়ায়। স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টারমশাই নকুলবাবুর কাছে শুনেছেন উনি, সন্ত্রাসবাদী হামলা, বিমান ছিনতাই ইত্যাদি থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক ডাকাতি রুখতেও নাকি এমন সব মহড়া চলছে সর্বত্র। তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, দারোগাবাবুকে অন্ধকার বাঁশঝোপ থেকে ডেকে নিয়ে এসে সম্যক অতিথি আপ্যায়নের।

ব্রজসুন্দরবাবুর এহেন প্রস্তাবে চমকে উঠল রতন আর মানিক। সম্বিৎ ফিরে পেতেই বুঝতে পারল, কর্তব্যে চরম

গল্প

অবহেলা দেখিয়েছে তারা দপ্তরের গোপন তথ্য ফাঁস করে। ব্রজসুন্দরবাবুকে কোনওক্রমে নিবৃত্ত করে তাঁর বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়াই মনস্থির করল মানিক-রতন।

"বড়বাবু আমাদের আর আস্ত রাখবেন না রে মানিকে।" ভয়ে-ভয়ে বলল রতন।

"আজ তবে চল, পালাই বরং! কাল বড় গিন্নিমার পায়ে পড়ব'খন।" মানিকের ভয়ার্ত উত্তর।

রতনেরও মনে ধরে কথাটা। অতএব দু'জনে আলোয়ানে মুখ ঢেকে চুপিচুপি পিটটান দেয়।

সদর দরজার কাছে ফোর্স নিয়ে ওত পেতে বসে থাকা গোরাচাঁদবাবু এসবের বিন্দুবিসর্গও টের পেলেন না। একরকম অধৈর্য হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে স-ফোর্স থানায় ফিরে যাওয়া মনস্থ করলেন তিনি। মানিক আর রতন দু'-দু'জন কনস্টেবল একসঙ্গে গুম হয়ে যাওয়ায় কিছুটা চিন্তিত হয়েও পড়লেন বটে। এই রাতে ঘুমে ঢুলুঢুলু অর্ধচেতন ফোর্স নিয়ে ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়িতে অভিযানের সাহস করে উঠতে পারছিলেন না, আবার মানিক-রতনকে এই অবস্থায় বিপদের মধ্যে ফেলে নিরাপদ দূরত্বে ফিরে যেতেও তাঁর মন চাইছিল না।

যাই হোক, মনের কথা মনে চেপে বিফল মনোরথ গোরাচাঁদবাবু সবে জিপের ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে আপাতত থানায় ফিরে যাওয়ার হুকুম দিতে যাবেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন, আবছা অন্ধকারে একটা কালো ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে চুপিসাড়ে ব্রজসুন্দরবাবুর বাড়ির দিকেই।

তিনি নিজের আশপাশ চেয়ে দেখলেন, তাঁর অবশিষ্ট ফোর্স মায় ড্রাইভার পর্যন্ত সকলেই অর্ধচৈতন্যের স্তর পেরিয়ে এখন গভীর ঘুমে অচেতন। একমাত্র তিনিই জেগে আছেন তীর্থের কাকের মতো নিদ্রাহীন।

কিন্তু এ সুযোগ ছাড়া যাবে না। ওই ছায়ামূর্তির একটা কোনও রহস্য আছে ভেবে তিনি জিপ থেকে নেমে একা-একাই গেলেন। তারপর পিছন থেকে গুড়ি মেরে গিয়ে একেবারে জাপটে ধরেলেন ছায়ামূর্তিটাকে। ছায়ামূর্তিটা তখন তার চাদর ফেলে দিয়ে কোনওক্রমে গোরাচাঁদবাবুর হাত থেকে ছিটকে পালানোর চেষ্টা করছে।

গোরাচাঁদবাবুও ছাড়বার পাত্র নন। এই অন্ধকারেও তিনি বেশ ভালরকম সাঁড়াশির প্যাঁচে পেড়ে ফেললেন চোর ব্যাটাকে। তারপর ঠেলতে-ঠেলতে তুলে দিলেন জিপে।

ঠেলাঠেলিতে অবশ্য গোরাচাঁদবাবুর ফোর্সের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙেই চোরটাকে দেখে ভূত ভেবে সকলেই এদিক-ওদিক পালাবার উপক্রম করেছিল। গোরাচাঁদবাবুর আশ্বাসে একে-একে তারা জিপে ফিরে এল। রাতের অন্ধকার ভেদ করে চোরটাকে নিয়ে তাদের জিপ ছুটে চলল থানার দিকে।

থানায় নিয়ে গিয়ে চোর বাবাজীবনকে একেবারে লকআপে পুরে ভাল করে তালা লাগিয়ে দিলেন নিজের হাতে। আবছা আলোয় দেখলেন, না, একেবারে ছোট ছেলেই বলা চলে। বয়স বড়জোর আঠারো-উনিশ। খালি গায়ে ঠান্ডায় ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে ছেলেটা।

লকআপে তালাচাবি মেরে থানার বাকি সকলকে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি নিজেও ফিরে গেলেন তাঁর কোয়ার্টার্সে। গিন্নি যথারীতি না খেয়ে টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে বসে আছেন তাঁর পথ চেয়ে। এত বছর হলেও তিনি গিন্নির এ-অভ্যাস ত্যাগ করাতে পারলেন না।

হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে খেতে বসলেন গোরাচাঁদবাবু। দেড় বছর এখানে এসেছেন। এই প্রথম একটা চোর ধরতে পেরেছেন তিনি। মনটা রতন আর মানিকের জন্য কিছুটা বিষণ্ণ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছে তাঁর। হাতে করে ভাত মুখে তুলতে গিয়ে থেমে যান। অল্পবয়স্ক চোরটার বিষণ্ণ চোখ দু'টো ভেসে ওঠে ছবির মতো।

গিন্নিকে চোর ধরা পড়ার কথাটা বললেন খাওয়া থামিয়েই। গিন্নিও পড়তে পারেন গোরাচাঁদবাবুর আপাত কঠিন মনের ভাষা। একটা থালায় করে রুটি-তরকারি সাজিয়ে সঙ্গে একটা চাদর নিয়ে গোরাচাঁদবাবুর সঙ্গে-সঙ্গেই চললেন লাগোয়া থানার দিকে। অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে লকআপে। চোরটা মাথা নিচু করে বসে আছে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল।

ঝনঝন করে লকআপের চাবিটা খুলে খাওয়ার থালাটা এগিয়ে দেন দারোগাগিন্নি, "নাও বাবা, খেয়ে নাও। পেটে তো কিছুই পড়েনি! কেন যে চুরি করতে যাও বাপু, বুঝি না।"

ছেলেটা মুখ তুলে তাকায়। বুকের ভিতরটা হু-হু করে ওঠে দারোগাগিন্নির। এ তো তাঁর সতুরই বয়সি। বেঁচে থাকলে ঠিক এরকম বড়টাই হত সতু। মাত্র সাত বছর বয়সে তিন দিনের জ্বরে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল সতু। ঠিক এরকমই গভীর কালো চোখ দু'টো। এরকমই একমাথা ঝাঁকড়া চুল ছিল তার।

গোরাচাঁদগিন্নির ইচ্ছে, ছেলেটার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেন। ছেলেটা বসে-বসে গোগ্রাসে খাচ্ছে।

"আহা রে, কতদিন বেচারি হয়তো খায়নি পেট ভরে। অভাবেই স্বভাব নষ্ট।" বিড়বিড় করলেন তিনি।

গোরাচাঁদবাবু চোর ছেলেটার খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর ভাল করে তালাচাবি মেরে দিয়ে গিন্নিকে নিয়ে ফিরে এলেন কোয়ার্টার্সে। ভাবলেন পরবর্তী পদক্ষেপ পরদিনই নেওয়া সমীচীন হবে। রতন আর মানিকের খোঁজ লাগাতে হবে, আর ছেলেটাকে কোর্টে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ একটা চিন্তায় ঘুম ভেঙে গেল গোরাচাঁদবাবুর। ঘড়িতে তখন ভোর সাড়ে তিনটে। বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো ব্যাপারটা মাথায় খেলে গেল গোরাচাঁদবাবুর। তাড়াতাড়ি তিনি উঠে পড়লেন বিছানা থেকে। ভাল করে গরম জামা ইত্যাদি গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি লকআপের উদ্দেশ্যে।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। এই আপ্তবাক্যই এখন তাঁকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি মনে-মনে ভাবতে থাকেন, এই পুঁচকে চোর ছেলেটাকে সদরে চালান দিয়ে কী হবে, বরং ওকে যদি পালানোর সুযোগ করে দিয়ে নিজের বুদ্ধিটা কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া যায় তবে আখেরে তা বৃহত্তর অপরাধী ধরতে কাজে লাগবে।

কালবিলম্ব না করে তিনি সোজা লকআপে গিয়ে নিজের হাতে তালাচাবি খুলে দিলেন। ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তিনি ভাবলেন, ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। ঘুম থেকে উঠে হাজতের দরজা খোলা দেখলে অবশ্যই পালাবে। আর পালালেই

তাঁর বুদ্ধি বেড়ে যাবে এক লাফে অনেকটাই। নিশ্চিন্তে কোয়ার্টার্সে ফিরে একটু ঘুমিয়ে নিলেন গোরাচাঁদবাবু।

সকালবেলা চাপা উত্তেজনা নিয়ে দাঁতন করতে-করতেই পৌঁছে গেলেন তিনি থানার লকআপে। কেউ এসে পড়বার আগেই। লকআপের দরজা হাট করে খোলা, কিন্তু এ কী! পালায়নি তো ছেলেটা। সে শুয়ে আছে এখনও।

তাড়াতাড়ি হাজতের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন গোরাচাঁদবাবু। ভাবলেন দিনেরবেলা কেউ দেখে ফেললে মুশকিল। রাত্রিবেলা করেই ট্রাই নিতে হবে বুদ্ধি বাড়ানোর।

ওদিকে গোরাচাঁদগিন্নির বিশেষ মায়া পড়ে গিয়েছে ছেলেটার উপর। বিশেষত সতুর সঙ্গে বেশ কিছু মিল খুঁজে পেয়েছেন তিনি। "দাও না গো, কচি ছেলেটাকে ছেড়ে," কিছুটা আবদারের সুরেই বললেন দারোগাগিন্নি।

"বললেই তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না! আইনকানুনের অনেক মারপ্যাঁচ আছে।" কপট গাম্ভীর্যে বললেন গোরাচাঁদবাবু। আর মনে-মনে ভাবলেন, ছেড়ে দিলেই বা পালাচ্ছে কে! এত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তা সত্ত্বেও পালাচ্ছে না। পালালে তো ওর কোনও ক্ষতি ছিল না, বরং মাঝখান থেকে বুদ্ধির দিক দিয়ে কিছুটা লাভবান হতেন তিনি।

পরের রাতটাও কাটল গোরাচাঁদবাবুর চরম উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে। যদিও দিনেরবেলাতেও উত্তেজনার অভাব ছিল না। বহু দশক পরে একজন চোর ধরা পড়ার ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে গেল নিস্তরঙ্গ ঝঞ্ঝাটপুরে। আপামর গ্রামবাসী চোর নামক জীবটিকে দেখতে ছুটল থানায়। বড়দিনের চিড়িয়াখানার মতো জনাকীর্ণ হয়ে উঠল থানা-চত্বর। থানার সবচেয়ে পুরনো স্টাফ হোমগার্ড রামদেও এই সুযোগে একটা পেতলের থালায় জবাফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখল। হরিজমাদার আলতা দিয়ে লিখে দিল প্রণামী। দু' টাকা-পাঁচ টাকায় উপচে পড়ল প্রণামীর থালা। রতন-মানিকের গায়েব হওয়ার কথা বেমালুম ভুলে থানার সকলে ব্যস্ত রইল দর্শনী তুলতে আর ভিড় সামলাতে।

ওদিকে রতন আর মানিক দু' দিন পালিয়ে থাকার পর গোরাচাঁদগিন্নির পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ল, "মাঠাকরুন, বাঁচান আমাদের বড়সাহেবের হাত থেকে। এবার নির্ঘাত দারোগাসাহেব আমাদের চাকরি খেয়ে ফেলবেন।"

"চাকরি খাবেন কেন? চাকরি কি পাটালি নাকি?" দারোগাগিন্নি জানেন, তাঁর স্বামী পাটালি খেতে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু চাকরির কথা তিনি আজই প্রথম এদের মুখে জানলেন। "তোমাদের কোনও ভয় নেই, যাও, আমি তো আছি!" বলে সান্ত্বনা দিয়ে ওদের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

এদিকে গোরাচাঁদগিন্নি যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন চোর ছেলেটাকে নিয়ে। নিয়ম করে সময় মেপে হাতে গরম খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তেল, জল, সাবান, তোয়ালে, ব্রাশ-পেস্ট সবকিছুই সরবরাহ করছেন পুত্রস্নেহে। শুধু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন গোরাচাঁদবাবু। তিন-তিন দিন হয়ে গেল, প্রতি রাতেই তিনি নিয়ম করে হাজতের দরজা খুলে রাখছেন। কিন্তু চোর হতভাগার পালানোর নামগন্ধ নেই।

গোরাচাঁদবাবু জানেন, এভাবে বেশিদিন আইনের চোখে ফাঁকি দেওয়াটা ঘোর বেআইনি কাজ। ছেলেটাকে চালান দিতে হবেই কোর্টে। কিন্তু ছেলেটার নিজের দেওয়া স্বীকারোক্তি আর রহস্যজনকভাবে রাতে ঘোরাফেরা, এ ছাড়া অন্য কোনও জুতসই অপরাধের চার্জ আনা তো সম্ভবই নয়। ছেলেটাকে তো বমাল সমেত পাকড়াও করেননি তিনি। এই সামান্য অপরাধের জন্য এত হাঙ্গামার কোনও মানে হয় না।

"কী নাম রে তোর?" বেশ ঘনিষ্ঠ স্বরেই প্রশ্ন করেন গোরাচাঁদবাবু।

"আজ্ঞে, হারাধন দে, ডাকনাম হারু।" উত্তর দেয় ছেলেটা।

"হারাধন দে!" বেশ রোমাঞ্চিত হলেন গোরাচাঁদবাবু। বললেন, "তোর নামের সঙ্গে কাজের এমন আসমান-জমিন ফারাক কেন? তোর তো উচিত গৃহস্থের খোয়া যাওয়া জিনিসের পুনরুদ্ধার করা। তোর তো চোর না হয়ে পুলিশ হওয়াই উচিত ছিল রে।" পরামর্শের ভঙ্গিতেই বললেন গোরাচাঁদবাবু।

ছেলেটার সঙ্গে আলাপচারিতায় গোরাচাঁদবাবু জানতে পারলেন, পাশের গাঁ নিশ্চিন্তপুরের ছেলে সে। মা-হারা ছেলেবেলাতেই। বাবা আবার বিয়ে করেছেন। সৎ মা'র অত্যাচার মাত্রাছাড়া। বাবাকে জানাতে গিয়ে বাবার হাতেও নিগৃহীত। অনেক দিন ধৈর্য ধরে থেকেও শেষমেশ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসা। কোনও কাজকম্ম না জোটায় প্রায় অনাহারে দিনযাপন। এই প্রথম খিদের জ্বালায় চুরি করতে যাওয়া এবং ধরা পড়া।

ছেলেটা নিজের কাহিনি বলে চোরের মতোই মাথা নিচু করে থাকে। গোরাচাঁদবাবু একবার ভাবলেন, ছেলেটাকে তিনি বলবেন, পালিয়ে যেতে। সদরে চালান করলে এখানকার মতো আদরযত্ন কপালে জুটবে না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, ওকে কথাটা বলে দিলে তো আর পালানো হল না। ওর চলে যাওয়া হল, আর চোর চলে গেলে তো বুদ্ধি বাড়ে না, একমাত্র পালালেই তা সম্ভব। সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে কোয়ার্টার্সে ফিরে যান। ফিরে দেখেন, গিন্নি একটা মাছের বাটি হাতে নিয়ে প্রস্তুত, "একটু সরষে-ইলিশ করেছি,

১৯৩২ সালের প্রথম কোষগ্রন্থ জনপ্রিয় 'শিশুভারতী' আবার ফিরে এলো স্বমহিমায়, সহজ ভাষায়। আজকের দাদু-দিদাদের কাছে একসময়ে যা ছিল স্বপ্নের ভান্ডার তা আবার নতুন আগ্রহে তুলে দিন নাতি-নাতনিদের হাতে।
শিশুভারতী সেরা সংকলন
অমর জীবন
দাম : ১২০ টাকা
পৃথিবীখ্যাত ৫৩জন মনীষীর জীবন, কর্ম, উপলব্ধি ও বাণী
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস • ফোন: ২২৪৪-৫৯২৪, ২২২৭-২৩৩৬
পাবেন : দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড, আদি নাথ ব্রাদার্স, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, সর্বোদয়

বাংলায় কম্পিউটারের বই
কৌশিক দত্ত ও সোমা রায়চৌধুরীর
প্রাথমিক কম্পিউটার শিক্ষা ১২৫
ওয়ার্ড ১২৫ এক্সেল ১২৫
পাওয়ারপয়েন্ট ৮০ ইন্টারনেট ৭৫
কোরেল ড্র ১২৫ পেজমেকার ৭৫
অ্যাডোব ফটোশপ ১৫০
স্কুলের পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য অবশ্যপাঠ্য বই
সহজে শেখো কম্পিউটার
(১, ২, ৩, ৪)
অঞ্জলি প্রকাশনী
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, শপ ১৬ (দোতলা)
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
ফোন : ০৯৪৩৩৪২৮০৯১/০৯৪৩৩৪২৮০১৩
E-mail: anjaliprokashani@hotmail.com / @yahoo.co.in

দিয়ে আসি হতভাগাটাকে।"

গোরাচাঁদবাবু বুঝতে পারলেন গিন্নির ব্যথার জায়গাটা, কিছুই বললেন না। তাঁর ক্ষণজন্মা ছেলে সতুও অল্প বয়সেই ইলিশমাছ খেতে খুব ভালবাসত। অন্য কোনও খাবারের প্রতি কোনওরকম টান ছিল না তার। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। মনটাকে শক্ত করলেন।

যথারীতি রাত্রিবেলা হাজতের দরজাটা খুলে রেখে দিলেন তিনি, রোজকার মতো থানার সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পরই। আর বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ছটফট করতে লাগলেন। সেই একই ভাবনা, আজ ছেলেটা না পালালে বুদ্ধি তো বাড়বেই না! পরন্তু মেমো, চার্জশিট, সব রেডি করে সদর আদালতে চালান দিতে হবে, সে বিষম ঝক্কির ব্যাপার। বিশেষত ঝঞ্ঝাটপুরের মতো নির্ঝঞ্ঝাট থানায়।

থানায় চোর দেখতে আসার বহরটা অবশ্য বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে। সাধারণ পাবলিক সব কিছুই খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়, দীর্ঘ পুলিশি অভিজ্ঞতায় একথা জানেন গোরাচাঁদবাবু। চোর ছেলেটা পালিয়ে গেলে প্রথম কিছুটা মাতামাতি হবে, মিডিয়ার দৌরাত্ম্য হবে। তারপর অবশ্য সব কিছুই ধামাচাপা পড়ে যাবে। কিন্তু চোরটাকে আবার আদালতে নিয়ে যাওয়াটা একটা ইভেন্ট অবশ্য হবে গ্রামবাসীর কাছে। পঁচিশ বছর পর আবার একটা চোরের ধরা পড়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। একবার মনে-মনে ভাবলেন গিয়ে দেখে আসবেন কিনা, চোরটা হয়তো পালাল! পরক্ষণেই ভাবলেন, এই ঠান্ডায় কী-ই বা লাভ হবে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে? গিয়ে হয়তো দেখবেন বেআক্কেলে ছেলেটা খেয়েদেয়ে বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

নাঃ, বিছানা ছেড়ে উঠেই পড়লেন গোরাচাঁদবাবু। আস্তে-আস্তে লকআপের কাছে গিয়ে দেখলেন, লকআপের দরজাটা একেবারে হাট করে খোলা। আরে, আনন্দে লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করতে গিয়ে কোনও রকমে সামলে নিলেন তিনি। পালিয়েছে বেটা, পালিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এমনকী, পালিয়ে যাওয়ার সময় হাজতের তালাটাকেও ভেঙে রেখে গিয়েছে বুদ্ধি করে। চমৎকার। এত দিনের ধরে থাকা ভারী মাথাটা হঠাৎই হাল্কা হয়ে যায় তাঁর। তিনি বুদ্ধি বাড়ার ব্যাপারটা পরিষ্কারই বুঝতে পারলেন। যারপরনাই কৃতজ্ঞ হলেন ছেলেটার উপর।

তাড়াতাড়ি হেঁটে কোয়ার্টার্সে ফিরে চললেন গোরাচাঁদবাবু। দারুণ উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে। কতক্ষণে ঘটনাটা তিনি গিন্নিকে জানাবেন, এত দিন বলতে পারেননি, পাছে গিন্নি চোরটাকে পালাতে বলে দেন।

ঘরে গিয়েই গোরাচাঁদবাবু গিন্নিকে ডাকলেন। গিন্নি যেন তাঁর ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। এসে বললেন, "কী হল, রাত দুপুরে এমন হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছ কেন? হয়েছেটা কী?"

আজ ভারী আনন্দ গোরাচাঁদবাবুর মনে। তিনি গিন্নির হেঁড়ে গলায় বলা প্রসঙ্গে কিছুই গায়ে মাখলেন না। বরং উল্লসিতভাবে বললেন, "জানো গিন্নি, চোরটা পালিয়েছে। পালিয়ে একদম পগার-পার হয়ে গিয়েছে।"

গিন্নি কিন্তু ঘটনার ঘনঘটায় উত্তেজিত হলেন না মোটেও। বরং তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর, "হুঁ।"

এমন উত্তেজক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এতটুকু উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না গোরাচাঁদবাবু। তিনি গিন্নিকে ভেঙে বলতে গেলেন, "বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? একটা চোর থানার লকআপ থেকে পালানো মানে..."

"জানি, জানি, দারোগার বদনাম তো!" আবারও উত্তর দেন গিন্নি।

"না, না, বদনাম তো পরের প্রশ্ন। তুমি ভাবো তো, থানা থেকে আস্ত একটা চোর পালানো!" আকুল হয়ে বোঝাতে থাকেন তিনি।

"লক্ষ চোরের দেশে কোনও ব্যাপারই নয়।" আবারও চরম হতাশাব্যঞ্জক উত্তর গিন্নির।

"তা বটে, তবে দ্যাখো, চোর পালানো মানেই বুদ্ধি বেড়ে যাওয়া। ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্ক, বুঝতে পারছ তো," না থেমেই, কথাটা বলে ফেললেন গোরাচাঁদবাবু। নিজের বুদ্ধি যে এক ধাপে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।

"ও মা, পালাবে কেন? পালালেই হল! আমি থাকতে ও পালিয়েই বা যাবে কোথায়?" গভীর বিস্ময়ে উত্তর দেন গোরাচাঁদগিন্নি। কথায় তাঁর মাতৃমায়া ঝরে পড়ে।

শুধু নিজের বুদ্ধি বাড়ানোর দিকেই নজর দিয়েছেন তিনি। গিন্নির যে বুদ্ধি দিনে-দিনে লোপ পাচ্ছে, সেদিকে বিন্দুমাত্র নজরও দেননি। নিজের এহেন স্বার্থপরতায় বেশ লজ্জিত হন গোরাচাঁদবাবু। যত কষ্টই হোক, পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতেই হবে গিন্নির কাছে। তিনি একরকম মরিয়া হয়েই বললেন, "না গিন্নি, একেবারে পালিয়েই গিয়েছে। লকআপের গরাদের তালা ভেঙেই পালিয়েছে পাখিটা। বুঝতে পারছি, তোমার মনের অবস্থা। তবে আমার দিকটাও একটু ভেবে দেখো। চোর পালানোর মধ্যে দিয়ে আমার বুদ্ধি কিছুটা বাড়ুক সহধর্মিণী হিসেবে সেটাও তো তোমার দেখা দরকার!" খোলসা করলেন তিনি।

"পালিয়ে গিয়েছে না হাতি!" মুখ ভেংচে বলে উঠলেন দারোগাগিন্নি।

"হাতি হতে যাবে কেন, পাখি মানে আই মিন ওই চোর ছেলেটা গো! খাঁচা থেকে পালানোয় পাখিদের মৌলিক অধিকার রয়েছে। যেমন, চোরেদের লকআপ থেকে পালানোয়। তাই ছেলেটাকে আমি পাখি বলেছি।" বুদ্ধিশুদ্ধি তলানিতে পৌঁছনো গিন্নির কাছে বিশদ ব্যাখ্যা করতে হয় গোরাচাঁদবাবুকে।

"মোটেও পালায়নি সে, দেখবে এসো," বলেই গোরাচাঁদবাবুর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে পাশের ঘরে নিয়ে আসেন গিন্নি।

কাণ্ড দেখে বাকরহিত হয়ে যান গোরাচাঁদবাবু। এ কী! ছেলেটা তো তাঁদের ঘরে খাটের উপর দিব্যি শুয়ে ঘুমোচ্ছে লেপ চাপা দিয়ে।

বাকরহিত গোরাচাঁদবাবুকে কিছু বলতে না দিয়ে গিন্নি বললেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, ঠিক আমাদের সতু না! বারো বছর পর আবার ফিরে এসেছে আমাদের ঘরে। ওকে আমি আমার কাছ থেকে কোথাও নিয়ে যেতে দেব না। যদি জেলে যেতে হয়, মা-ছেলে দু'জনেই যাব।"

শীর্ণ ছেলেটার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মনটা একটা অদ্ভুত পূর্ণতার অনুভূতিতে ভরে ওঠে গোরাচাঁদবাবুর। তিনি গিন্নিকে আর কিছুই বলতে পারলেন না।

ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

একশোয় একশো

সমীরণ রায়

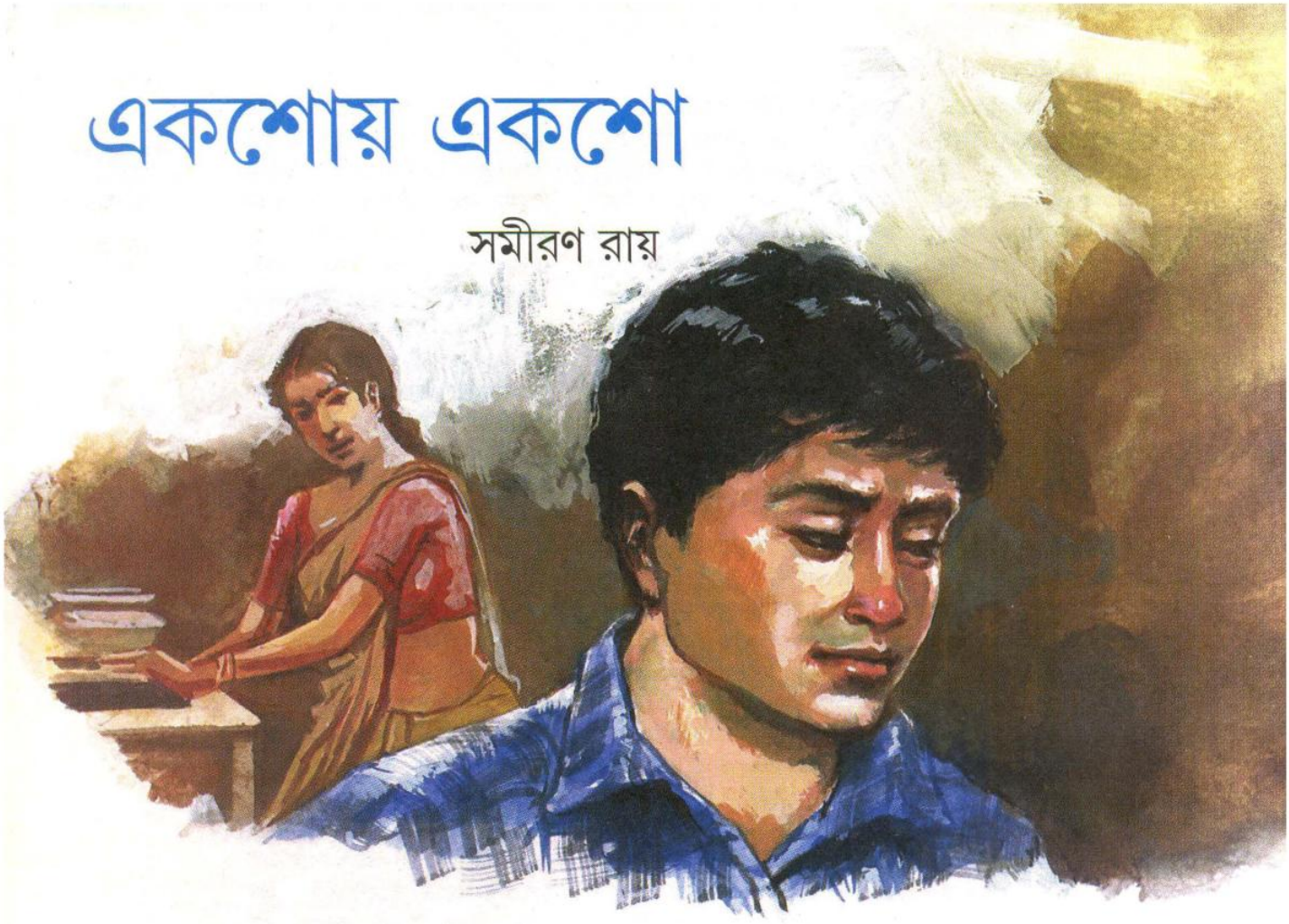

একনজরে রেজাল্টের লিস্টটা পড়ে ফেলতেই বাবার মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রবালের। তখনই টেনশন শুরু হয়ে যায়, প্রবাল যে এবার হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করতে পারবে না, সেটা ও ইংরেজি পরীক্ষা দিয়েই বুঝতে পেরেছিল।

বাবার অসুস্থতার জন্য পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব প্রবালের কাঁধে পড়ে। সব দিক সামলে উঠতে-উঠতে প্রবাল দেখল, পরীক্ষা আর এক মাসও বাকি নেই। অন্যান্য সাবজেক্ট একটু-একটু করে তৈরি থাকলেও, ইংরেজি একদম তৈরি হয়নি। বড়-বড় সব প্রশ্নের উত্তর, কবিতার লাইন তুলে-তুলে উত্তর। পরীক্ষার জন্য বাবা লিখতে শুরু করেছিলেন উত্তরগুলো। প্রবাল বুঝে-বুঝে পড়ে মুখস্থ করে নেবে সেগুলো। বাবা পড়াতেন ইংরেজিটা।

বাবা অসুস্থ হয়ে চার মাস বিছানায়। হয়তো সারা জীবনই বিছানায় কাটাতে হবে। ডাক্তার, ওষুধ, ফলমূল, নানা দরকারে অনেক খরচ হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। বাবা রিটায়ার্ড স্কুলমাস্টার। সামান্য কিছু টাকা পেনশন। প্রবাল আলাদা করে আর ইংরেজির জন্য টিউশন নেয়নি। ওই বাকি দিন ক'টা ইংরেজিটাকে কিছুটা বাগে আনার চেষ্টা করেছিল। বাজার থেকে একটা লাস্টমিনিট সাজেশন কিনে ও নিজে লটারির মতো বেছে-বেছে কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করেছিল। প্রবালের লটারি মিলল না। যেসব প্রশ্ন পরীক্ষায় এল, তার বেশিরভাগ প্রবালের সাজেশনে ছিল না। ইংরেজিতে ব্যাক।

স্কুল গেটের সামনে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল প্রবাল। অয়ন, অসীম, সুনন্দ সকলে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছে। সুনন্দ বলছিল, "তোর জন্য এত খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে, আমি পাশ করে অন্যায় করে ফেললাম।"

প্রবাল হাল্কা হেসে ওদের বলেছিল, "তোরা বাড়ি যা, আমার জন্য থাকতে হবে না। বাড়িতে তোদের জন্য সকলে ওয়েট করছেন। আমি ঠিক বাড়ি চলে যাব।"

এবার স্কুলের রেজাল্ট ভাল হয়েছে। যাদের পাশ করার কথা নয়, তারাও কোনওভাবে পাশ করে গিয়েছে। প্রবালের যে কী হল! অয়ন, সুনন্দরা নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে খুব আনন্দ করছে। কাকা, কাকিমারা হয়তো ওদের মুখে মিষ্টি তুলে দিচ্ছেন। বাবা-মায়ের মুখটা ভেসে উঠল।

প্রবালের টেনশনের কারণ ওর বাবাকে নিয়ে। বাবা প্যারালিসিসে আক্রান্ত। ডান দিকের কাঁধ থেকে হাত পর্যন্ত এবং পুরো পাঁজরে কোনও সাড় নেই। এর মধ্যে দু'বার স্ট্রোক হয়েছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, বাবাকে খুব সাবধানে রাখতে। বাবা যেন কোনও কারণে মনে আঘাত না পান। বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেন কিছু না হয়।

কয়েক মাস ধরে প্রবাল বুঝতে পারছিল বাবা তার উপর বেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। বাবা প্রায়ই প্রবালকে নানাভাবে অনেক কিছু উপদেশ দিতেন। বাবা বলতেন, "আগে স্বপ্ন দ্যাখো, পরে তাকে বাস্তবে রূপ দিতে শেখো।" বাবা পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে অসৎ পথ মাড়াননি কোনও দিন। মিথ্যাকে কোনও দিন প্রশ্রয় দেননি।

বাবা চান, প্রবালও অনুসরণ করুক তাঁকে।

বাবা রামকৃষ্ণ, গাঁধীজিকে মানেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সৎ পথে চলতে গেলে হয়তো অনেক বাধা আসবে, সাফল্য আসবে দেরিতে। কিন্তু শেষে যে সাফল্য আসবে, জীবনে কখনও মাটিতে নুয়ে পড়বে না। বাবা শিক্ষক জীবনে কোনওদিন ফাঁকি দেননি। মন-প্রাণ দিয়ে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন ছাত্রদের। সরকার থেকে বাবাকে জাতীয় শিক্ষকের সম্মান দিয়েছে। প্রবালের উপর বাবার অনেক আশা। প্রবালও বাবাকে মেনে চলে। চেষ্টা করে মিথ্যে থেকে দূরে থাকার।

চুপচাপ রাস্তার একধার দিয়ে আসছিল প্রবাল। সারদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে পা'টা আটকে গেল। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় বাবা বলেছিলেন, "প্রবাল, যাওয়ার সময় মা'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্কুলে যাবি। ফেরার সময় সারদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কিছু ক্ষীরের চপ আনিস তো, আজ সকলকে ক্ষীরের চপ খাওয়াব।"

প্রবাল বুক পকেটটা ফাঁক করে টাকাগুলোর দিকে তাকায়। মিষ্টির দোকানের কাচের শো-কেসের মধ্যে থরেথরে সাজানো আছে ক্ষীরের চপগুলো। প্রবাল আবার একবার বাবাকে দেখতে পায় চোখের সামনে। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। মাথায় কাঁচাপাকা অল্প চুল। বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে কোমরের কাছে দু'টো বালিশের ঠেস, একমনে কী যেন ভাবছেন।

রাস্তায় এখন প্রচণ্ড ব্যস্ততা। অফিস টাইম, স্কুল ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। এ ছাড়া প্রচুর চেনাজানা লোক। রোজ স্কুল যাওয়ার পথে তমালকাকার শেকড়ের দোকান, বিল্টুদের তুলো, বালিশের দোকান। অমরের চায়ের দোকান, রবিনকাকার সাইকেল সারানোর দোকান। প্রবালের মনে হল, আজ ওকে কেউ যেন চিনতে পারছে না। কেউ পাত্তা দিচ্ছে না ওকে। ও তো এখন ফেলু। ও তো পরীক্ষায় ফেল করেছে। হেরে যাওয়া মানুষকে কেউ পাত্তা দেয় না।

বাবাও কি প্রবালকে 'ফেলু' বলে ডাকবেন। প্রবাল যদি বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলে, 'বাবা আমি পাশ করতে পারিনি, ইংলিশে ব্যাক পেয়েছি।' তা শুনে বাবা খুব কষ্ট পাবেন মনে-মনে। আর এই আঘাতে যদি বাবার কিছু একটা হয়ে যায়! ডাক্তারবাবু বলেছেন, "এবার হলে নাকি বাবাকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে যাবে।" এদিকে বাবার আদর্শ, সততা। কী করবে প্রবাল? কিছু সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

প্রবাল রাস্তা থেকে বাবাকে দেখতে পায়। বাবার চান হয়ে গিয়েছে। মা বাবাকে চান করিয়ে দেন। বাবা সেই পাঞ্জাবিটা আজ পরেছেন, যেটা পরে বাবা রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কারটি নিয়েছিলেন। বাইরের ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন বাবা। প্রবাল দু' মিনিট দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখতে থাকে। মাথার উপর দিকে একটা পাখি ডেকে গেল। বাবা শুয়ে-শুয়ে কী ভাবছেন? প্রবালের কথা? 'প্রবাল, তোকে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করতেই হবে।'

পাশ দিয়ে কে যেন সাইকেলের বেল

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায়
মজার ছবি।
১৫ টাকা

মহাশ্বেতা দেবীর আশ্চর্য বই
তুতুল ২৫ টাকা

কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
১৫ টাকা
লেখকের আরেকটি বই **চড়ুইয়ের সঙ্গে** ১৫ টাকা

মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি
৩০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই

আমাজনের জঙ্গলে
আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস। চতুর্থ মুদ্রণ। ৪০ টাকা
'গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'—মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল।

পাগল করা ছন্দে দম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প

হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
৪৫ টাকা

শাদা ঘোড়া
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পর্যায়ক্রমে অনূদিত হচ্ছে। ১৫ টাকা

ঋষিকুমার
ডাকাত, ছেলেধরা, বেদে, বাঁশিওয়ালার সঙ্গে নানা রোমাঞ্চকর অভিযান।
২০ টাকা

গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ৪০ টাকা

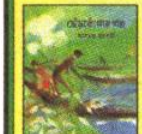

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের নতুন বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প। ৫০ টাকা

লেখকের ছোটদের আরও বই
পাখির খাতা ২০ টাকা টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী ১৫ টাকা
তালগাছের ডোঙা ২০ টাকা আমার বনবাস ১২ টাকা
হরিণের সঙ্গে খেলা ১৫ টাকা

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট) ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন
কমপক্ষে ২০০ টাকার বইয়ের অর্ডার দিলে আমাদের খরচে আপনার ঠিকানায় বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। টাকা পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 Ph: 2283-2320

দিতে-দিতে চলে গেল। প্রবাল বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে না ঢুকে পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকে। আগে মা'র সঙ্গে দেখা করতে হবে। মা'র কাছ থেকে জেনে নিতে হবে বাবাকে কী বলবে।

মা রান্নাঘরে। হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। মা গালে হাত দিয়ে এক মনে হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। প্রবাল পিছন থেকে ডাকে, "মা।"

ধড়ফড় করে উঠে আসেন মা। চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ, "কী রে, পাশ করেছিস তো?"

প্রবাল মাথা নাড়ে, "ইংলিশে ব্যাক।"

মা চাপা গলায় বললেন, "আস্তে, আস্তে। পাশের ঘরে বাবা আছেন, শুনতে পাবেন। তোর জন্য বসে আছেন। এখনও খাননি মানুষটা। বলেছেন, তুই এলে এক সঙ্গে খাবেন।"

প্রবাল এবার ভেঙে পড়ে, "মা, আমি এখন বাবার সামনে দাঁড়াব কী করে? কী বলব বাবাকে?"

মা আস্তে করে বললেন, "বলবি পাশ করেছিস, রেজাল্ট সোমবার দেবে। আমি দু' দিনের মধ্যে আস্তে-আস্তে বুঝিয়ে বলে দেব।"

প্রবাল অস্থির হয়ে ওঠে, "বাবাকে মিথ্যে কথা বলব, বাবাকে কিন্তু...।"

প্রবালের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মা বললেন, "আমার চেয়ে ভাল তোর বাবাকে আর কে চেনে বল তো!" মা প্রবালকে কাছে টেনে নেন। চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে দেন। কী ঠান্ডা মায়ের হাত! "তোর বাবার এই তো শরীরের অবস্থা! তুই জানিস না, কাল অনেক রাতে বাবার বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে ছিল। তোকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, তোর বাবা বারণ করলেন। বললেন, 'ছেলেটাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দাও। কাল সারাদিন কত ধকল যাবে...।' "

কিছু বুঝতে পারছে না প্রবাল, কী করবে। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

মা বললেন, "যা বাবু যা, বাবা অনেকক্ষণ বসে আছেন তোর জন্য।"

দরজাটা ঠেলে বাইরের ঘরে ঢোকে প্রবাল। বাবা ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। দরজার শব্দে চোখ খুললেন, "কে, প্রবাল এলি নাকি? অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি তোর জন্য। তোর সব বন্ধু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, আর আমি ভাবছিলাম, এবার বুঝি তুই এলি।" প্রবাল চুপ করে দাঁড়িয়ে।

"হ্যাঁ রে, কোন ডিভিশন পেলি? টোটাল কত হল তোর?"

প্রবালের মুখে কোনও কথা নেই। দরজার চৌকাঠে মা দাঁড়িয়ে। মায়ের চোখের কোণে জল। প্রবালকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হন বাবা। "কী হল রে, কিছু বলছিস না কেন! কোনও সাবজেক্টে নম্বর কম হয়েছে নাকি?"

থরথর করে কাঁপতে থাকে প্রবাল। সারা শরীরে তার গলগল করে ঘাম ঝরছে। শরীরের ভিতরে সব কিছু তোলপাড় করে উঠছে। ওর মুখের একটা কথা পরিবেশের অনেক কিছু বদলে দিতে পারে এখনই। কী বলবে প্রবাল?

"বাবা, আমি পাশ করতে পারিনি, ইংলিশে...।" হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে প্রবাল। যে কষ্ট এতক্ষণ ও বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, এখন তা গলে-গলে কান্না হয়ে ঝরছে। প্রবাল কাঁদছে।

"তুই এ কী করলি বাবু!" মা দ্রুত পায়ে ঘরে ঢোকেন।

বাবা আস্তে করে মাথাটা চেয়ারে ঠেকিয়ে চোখ বোজেন। বাবার দু' চোখ ভরে জলের ধারা নেমে আসছে গালে, "আমি অনেক আগেই গোপালের ছেলের কাছ থেকে খবরটা পেয়েছি।" খানিক থামলেন বাবা, "সারা জীবন মাস্টারি করে গেলাম। তাই পরীক্ষা নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না!"

প্রবাল কাঁদতে-কাঁদতে বাবাকে বলল, "আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সামনের বার ভালভাবে পাশ করব।"

বাবার চোখে জল, মুখে হাসি আনন্দের, গর্বের, "তুই ফেল করলি কখন! না, না, ওই পরীক্ষাই সব নয়! তার গণ্ডি তো একটুখানি। তুই তো জীবনের পরীক্ষায় পাশ করেছিস। আমার কাছে একেবারে একশোয় একশো।"

প্রবাল বাবার পায়ের কাছে বসে ছিল। বাবা বললেন, "আমার দিকে তাকা। দ্যাখ, আমাকে এখন অনেক দিন বাঁচতে হবে। তোর জন্য, তোদের জন্য।"

মায়ের মুখে কিছু একটা ফিরে পাওয়ার হাসি। প্রবালকে বুকের মধ্যে চেপে ধরেছেন। বাবার হাতটা প্রবালের মাথায়।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

নাঙ্গা পাহাড়ের মমি

সুখলতা মজুমদার

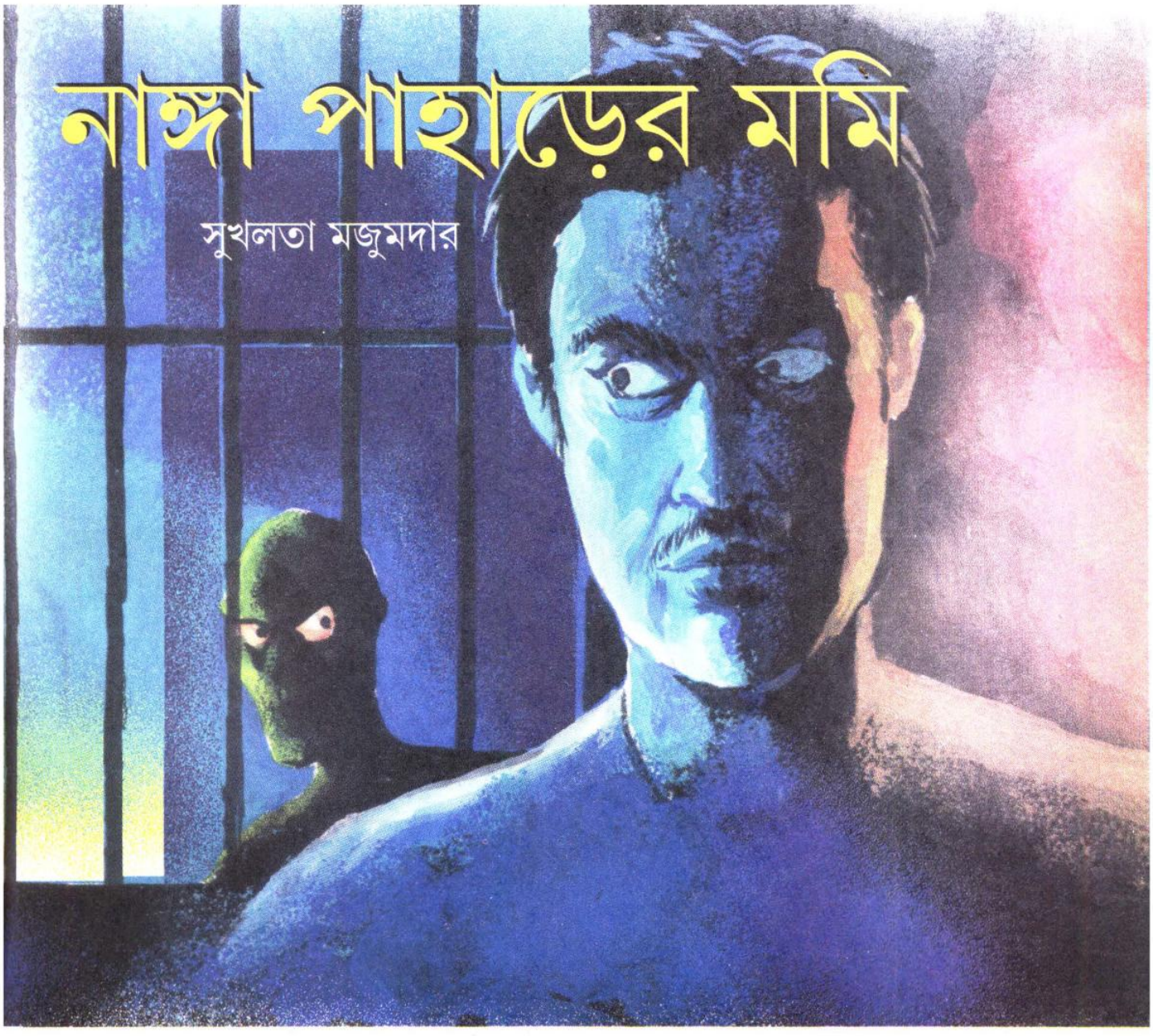

এবারের শীতটা জোর পড়েছে। একেবারে হাড়ের ভিতরটা কাঁপিয়ে দেয়। এত শীতের মধ্যে অয়ন হাতকাটা সোয়েটার পরে আয়েস করে গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছে। সায়ন সান্যাল ও অয়ন ব্যানার্জি রিজেন্ট পার্কে দু'টি ঘরের ফ্ল্যাটে থাকে। কাজের লোক বিপিন ও রাঁধুনি গোবিন্দ ওদের দেখাশোনা করে।

সায়ন কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অয়নের হাতে দিয়ে বলল, "পড়েছ খবরটা?"

"কী খবর?" অয়ন একটা মেডিক্যাল জার্নাল পড়ছিল, মুখ না তুলে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল।

"প্রোফেসর রবীন্দ্র ভাটিয়ার মৃত্যুর খবর।"

"ভদ্রলোকটি কে শুনি?"

"সে কী! তুমি ভুলে গিয়েছ? নাঙ্গা পাহাড়ে এক্সপিডিশনে যাওয়ার সময় অভিযানের নেতা প্রোফেসর রবীন্দ্র ভাটিয়া অভিযান শেষ না করেই ফিরে এসেছিলেন।"

"এই অভিযাত্রী দল বরফের স্তূপের মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো প্রস্তর যুগের এক মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল। এই মমির হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল পাথরের তৈরি হাতিয়ার।"

"এক্সপিডিশন কোন সময় হয়?"

"কেন, গত বছর। প্রোফেসর ভাটিয়া হলেন চতুর্থ ব্যক্তি, যিনি গত কাল কালিম্পংয়ে মাল্টিপল স্কিরোসিসে মারা গিয়েছেন।"

"খুব স্বাভাবিক মৃত্যু।"

সায়ন চটল না, স্বাভাবিক স্বরে বলল, "মনে রেখো, এটি চতুর্থ মৃত্যু। এর আগে আরও তিনজন মারা গিয়েছেন, যাঁরা এই অভিযানে শামিল হয়েছিলেন।"

অয়ন বিদ্রুপের স্বরে বলে উঠল, "মনে পড়ছে, তুমি বলেছিলে বটে, এক আইসম্যানের কথা। যাকে বরফ স্তূপের মধ্যে থেকে যাঁরা বের করেছিলেন,

তাঁদের পর-পর তিনজন মারা গিয়েছেন। একজন প্লেনক্র্যাশে, তাই না?"

"হ্যাঁ, তাঁর নাম ছিল দীনেশ গুপ্তা। তিনি একজন ফরেন্সিক সায়েন্টিস্ট ছিলেন। আইসম্যানের বয়সটা বা সে কত বছরের পুরনো মমি, সেটা তিনি বের করেছিলেন। সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এই প্রস্তর যুগের মানুষটি শিকারে বেরিয়েছিলেন। তখন তাঁর মত্যু হয়। দীনেশ গুপ্তা প্লেনে করে ভেনিসে এক সেমিনারে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন।"

"দ্বিতীয়জন শুনেছিলাম শেরপা তামাং, পাহাড়ে ধস চাপা পড়ে মারা যান। তিনি দাবি করেছিলেন যে, তিনি প্রথম ওই মমিকে দেখতে পান, তাই না? তৃতীয়জন কে?"

সায়ন চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, "তৃতীয়জন ফোটোগ্রাফার অক্ষয় সরকার, যিনি আইসম্যানটার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ফোটো তুলেছিলেন। তাঁর ব্রেন টিউমার হয়েছিল।"

"বুঝলে সায়ন, এগুলো ঘটনাচক্র। আর কিছু নয়। এসব মৃত্যুর সঙ্গে মমির কোনও সম্পর্ক নেই।"

"কারও-কারও ধারণা, এগুলো মমির অভিশাপ। বরফের শয্যায় মমি শান্তিতে হাজার বছর ধরে শুয়ে ছিল। তার ঘুম ভাঙিয়ে যাঁরা ওকে দার্জিলিংয়ের মিউজ়িয়ামে সুরক্ষিত রেখেছেন, তাঁরা একে-একে মারা যাচ্ছেন।"

"আর বাকি আছেন ক'জন?"

"দু'জন। প্রবীণ কাপাডিয়া, যিনি একজন ভূপর্যটক, উনি ওই আইসম্যানের বিষয়ে কাগজে একটি মুখরোচক কাহিনি লেখেন! ষষ্ঠজন প্রোফেসর হিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়।"

অয়ন চমকে উঠল, "প্রোফেসর হিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়? তিনি কী এক কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছিলেন না?"

"হ্যাঁ, মিউজ়িয়াম থেকে কুষাণ যুগের এক দুর্লভ পুঁথি সরিয়ে এক জার্মান পর্যটকের কাছে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। সেই দুর্লভ পুঁথি নিয়ে পর্যটক ভারত থেকে বেরোতে পারেননি। তার আগে তিনি গ্রেপ্তার হন।"

"আর সেই প্রোফেসর তো প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়েছিলেন।"

ঠিক সেই সময় ফোনটা বেজে উঠল সশব্দে। সায়ন উঠে ফোনটা ধরতেই শুনতে পেল এক অপরিচিত কম্পিত স্বর, "কে, মিস্টার সান্যাল? আমি ডাঃ হিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় বলছি। আমি খুব বিপদে পড়েছি, আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি বিশ্ববিখ্যাত অকালটিস্ট না? একমাত্র আপনি পারেন আমাকে বাঁচাতে। প্লিজ়, একবার আমার বাড়ি আসুন।" সায়ন হেসে বলল, "অলৌকিক বিদ্যার চর্চা করি বটে! বলুন, আপনার কী বিপদ?"

"রবীন্দ্র ভাটিয়ার মৃত্যুর খবর পড়েছেন তো? এবার আমার পালা। আজ তিন দিন হল, রাতে আমার দরজায় কে যেন নক করে!"

"কোনও পাজি লোক হতে পারে, যে আপনাকে ভয় দেখাতে চায়?"

প্রোফেসর বললেন, "গত পরশু রাতে সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিল। দেখলাম, সেই মমির বীভৎস মুখ, যাকে আমরা নাঙ্গা পাহাড় অভিযানে বরফের ভিতর থেকে বের করেছিলাম।"

"আপনার চোখের ভুল হতে পারে। সেই মমি দার্জিলিংয়ের মিউজ়িয়ামে রাখা আছে।"

"আরও শুনুন, গত রাতে তিনটের সময় ঘুম ভেঙে দেখি, সে আমার পাশে শুয়ে আছে। তার ঠান্ডা বরফ শরীরের ছোঁয়া আমার গায়ে লাগছে। ভয়ে, আতঙ্কে আমি মারা যাই আরকী! উঠে যে ঘরের আলো জ্বালব, সে সাহস আর হচ্ছে না। বাকি রাত আতঙ্কে কাঁটা হয়ে শুয়ে থেকেছি। এক রাতে আমার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে।"

"আপনার হ্যালুসিনেশন হতে পারে। কারণ, অন্য চারজনের মৃত্যুতে আপনি ভয় পেয়েছেন।"

"সকালে উঠে তাকে দেখতে পাই না। প্রতি রাতে যদি সে আমাকে বিরক্ত করে, আমি এবার মারা যাব!"

"ভয় পাবেন না প্রোফেসর বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা দিচ্ছি, আজ রাতটা আপনার সঙ্গে কাটাব। মমিটার দর্শন পেলে ওর টুঁটি চেপে ধরব।"

"ঠাট্টা করবেন না। ও তো ফসিল, কিন্তু কী ঠান্ডা, শক্ত শরীর ওর!"

সায়ন প্রশ্ন করল, "কত রাত অবধি আপনি জেগে থাকেন?"

"রাত এগারোটা আবধি পড়াশোনা করি।"

"ঠিক আছে, রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ আপনাদের ওখানে পৌঁছে যাব। আমার সঙ্গে এক ডাক্তার বন্ধু অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবে।"

"তা হলে ওই কথাই রইল।" ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন ছেড়ে দিলেন।

সায়ন হেসে অয়নকে বলল, "এখন বোঝ ঠেলা। মমি সুদূর দার্জিলিং মিউজ়িয়াম থেকে কলকাতায় এসে ডঃ হিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রোজ রাতে জ্বালাচ্ছে। দরজায় নক করছে, জানলা দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছে, পাশে শুয়ে থাকছে। আসলে পরপর চারজন মারা গিয়েছেন। অয়ন, আমরা রাত সাড়ে এগারোটায় ডঃ হিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পৌঁছব। মমি ভয় পেয়ে আবার আমাদের দর্শন নাও দিতে পারে।"

"যা বলেছ!" অয়ন হাসল।

অয়ন নিজে বাস্তববাদী, বিজ্ঞানমনস্ক। সায়নের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হওয়াটা আশ্চর্যজনক, কিন্তু সেটাই হয়েছে। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বটা প্রগাঢ়। অকালটিস্ট হিসেবে সায়ন দুরারোগ্য মানসিক রোগগ্রস্ত লোকেদের চিকিৎসা করে, ভূতের বাড়ির ভূত ভাগিয়ে দেয়। ওকে সোজা বাংলায় 'ওঝা' বলে। পারতপক্ষে ও ওঝা নয়, ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্রশক্তি দিয়ে ভূত তাড়ায় না। ও নিজের অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে ভূতকে জব্দ করে।

শীতের সময় রাত সাড়ে এগারোটা তো গভীর রাত। কলকাতার রাস্তার এদিকটা লোকচলাচল কম, বলতে গেলে একটা-দু'টো গাড়ির আওয়াজ বা রিকশার ঠুংঠাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। যদিও ক্রিসমাস এগিয়ে আসছে, তবে রিজেন্ট পার্কের এদিকটা শুনশান।

রাত এগারোটায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পৌঁছে ওরা যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীণ হল, সেটা ওরা আগে থেকে বুঝতে পারেনি। এখানে পৌঁছে ওরা জানতে পারল, প্রোফেসর রাত এগারোটা থেকে তাঁর লাইব্রেরি ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। বাড়ির কাজের লোকরা সায়নকে জানাল, রাত এগারোটা পর্যন্ত ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লাইব্রেরি রুমে পড়াশোনা করেন। তারপর এক কাপ কফি খেয়ে স্নান করে

শুতে চলে যান। ওঁকে লাইব্রেরি রুম থেকে বেরোতে না দেখে কাজের লোকরা বিচলিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ উনি কোথায় বেপাত্তা হলেন, কেউ কিছু বুঝতে পারল না। অয়ন ও সায়ন দেখল, বসার ঘরে আর-একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনিও খুব বিচলিত। সায়ন তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করতে তিনি জানালেন, "আমি প্রবীণ কাপাডিয়া। আমি একজন ভূপর্যটক। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে এখানে ফোনে ডেকে আনেন। দশটা থেকে আমি ওঁর জন্য অপেক্ষা করছি।"

সায়ন তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ পেলাম। আমি সায়ন সান্যাল, ইনি আমার ডাক্তার বন্ধু অয়ন ব্যানার্জি। আপনাদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা আমি জানি। আপনাদের অভিযানের চারজন অভিযাত্রী পরপর মারা গিয়েছেন।"

"অনেকে বলছে যে, মমির অভিশাপে এই মৃত্যুগুলো হয়েছে। তবে আমি অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করি না।"

"বাঃ, আপনি তো সুন্দর বাংলা বলেন!"

কাপাডিয়া হেসে বললেন, "আই অ্যাম বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন কলকাতা।"

"এই দুঃসাহসিক অভিযান সম্পর্কে আপনার মতামত কী?"

"আমরা বেশি দূর উঠতে পারিনি। হঠাৎ তুষারঝড় শুরু হয়। বেস ক্যাম্পে ফিরে আসবার সময় আমি বরফের ফাটলের মধ্যে মমির ফসিলটাকে পড়ে থাকতে দেখি, দলের লোকেরাও দ্যাখে।"

"আপনিই প্রথম আইসম্যানটাকে দেখেন?"

"হ্যাঁ, ওর বডিটা বরফে অর্ধেক ঢাকা ছিল, মাথাটা বেরিয়ে ছিল।"

মিঃ কাপাডিয়া অনেক ঘুরেছেন, খুব ভাল স্কি জানেন, পড়াশোনাও করেছেন প্রচুর। এর মধ্যে পুলিশ এসে পৌঁছল, তারা কাজের লোকদের জেরা করে হেনস্থা করল।

সায়নদের বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বেমালুম হাওয়ায় উড়ে গিয়েছেন। রাতের তারা ভরা আকাশ, টুকরো-টুকরো মেঘ। সায়নের গাড়ি শুনশান রাস্তা বেয়ে ছুটে চলল। গাড়িতে সায়ন বলল, "স্ট্রেঞ্জ! মিঃ কাপাডিয়া এক রহস্যময় মানুষ। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যে মিসিং, সেজন্যও কোনও উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তার ছাপ ওঁর চোখেমুখে দেখলাম না! অথচ ওঁরা এক অভিযানে সহযাত্রী ছিলেন।

অয়ন মন্তব্য করল, "আমার মনে হয়, মমিটাকে কে আগে দেখেছেন, এই নিয়ে প্রোফেসর বন্দ্যোপাধ্যায় আর কাপাডিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। তুমি বলছিলে, শেরপা তামাং মমিটাকে প্রথম দেখতে পান। আবার এও

বলেছিলে, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মমিটাকে প্রথম দেখেন। আবার কাপাডিয়া দাবি করছেন, তিনি আগে দেখেছিলেন। হয়তো বন্দ্যোপাধ্যায় উধাও হওয়ার পিছনে কাপাডিয়ার হাত আছে।"

"হতে পারে।" সায়ন, অয়নের কথার যুক্তিমর্ম বিচার করে বলল, "কাজের লোকরা হয়তো মিথ্যে বলছে। সম্ভবত কাপাডিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আগে এসেছেন। তারপর ওঁকে সরিয়ে দিয়েছেন।"

"কিন্তু কোথায়? তোমার অলৌকিক শক্তি কী বলে?"

"খুব একটা ছোট জায়গায় উনি বন্দি হয়ে আছেন, হয়তো মারা গিয়েছেন।"

"কেন তোমার এরকম মনে হল?"

"কে জানে, সেটা বলতে পারব না।"

"তা হলে পুলিশকে আমাদের সন্দেহের কথা বলা যাক, তারপর ওরা খুঁজবে।"

"কিন্তু জায়গাটা তো বলতে পারছি না। আসলে আমার সিক্সথ সেন্স একটা অলৌকিক তরঙ্গে গিয়ে আটকে যাচ্ছে, সেজন্য স্থানটা খুঁজে পাচ্ছি না।"

রিজেন্ট পার্কের বাড়িতে যখন ওরা ফিরল তখন রাত একটা। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যময় অন্তর্ধান ওদের দু'জনকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

পরদিন সকাল। সায়ন উঠেই টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘাঁটতে লাগল। খুঁজতে-খুঁজতে প্রবীণ কাপাডিয়ার ফোন নম্বর পেয়ে গেল। ওখানে ফোন করে জানল, মিঃ কাপাডিয়া সকালবেলায় বেরিয়ে গিয়েছেন।

শেষে সে লালবাজারের ডিটেকটিভ ইনস্পেকটর বেদব্রত মল্লিককে ফোন করে জিজ্ঞেস করল, "প্রোফেসর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও খোঁজ পেলেন?"

বেদব্রত মল্লিক বললেন, "আপনি অকালটিস্ট, আপনিই বলুন না।"

"উনি সম্ভবত নিজের বাড়িতে একটা ছোট জায়গায় বন্দি হয়ে আছেন।"

"এটা কী করে সম্ভব মিঃ সান্যাল?"

"আপনি একবার ওঁর আলমারি, দেরাজ খুঁজে দেখুন।" বলে সায়ন ফোন রেখে দিল।

রাত সাড়ে ন' টায় হঠাৎ ডিনার খাওয়ার আগে সায়ন অয়নকে বলল, "চল অয়ন, একবার মিঃ কাপাডিয়ার বাড়ি ঢুঁ মেরে আসা যাক। মনে হয় ওঁর কোনও বিপদ হয়েছে।"

অয়ন বিরক্ত হয়ে বলল, "যত সব অ্যাবসার্ড ধারণা! হঠাৎ কাপাডিয়ার বিপদ কেন হবে?"

"আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, মিঃ কাপাডিয়ার সমূহ বিপদ।"

অয়ন বিরক্ত হয়ে বলল, "এখন ওয়েলিংটন পৌঁছতে আমাদের ঘণ্টাখানেক লাগবে। কী দরকার ফ্যাসাদে পড়ার? তার চেয়ে ডিনার খেয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুলে ভাল নয় কি?"

"ডিনার আমরা সেরেই বেরোব। সঙ্গে নেব একটা বড় টর্চ, আর-একটা রিভলভার।"

"অগত্যা।"

ডিনার সেরে দু'জনে মিলে মোটা সোয়েটার গায়ে দিয়ে গাড়ি করে যখন বেরোল, তখন রাত এগারোটা। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের পর আশুতোষ মুখার্জি রোড হয়ে গাড়ি চৌরঙ্গির দিকে এগোল। আলোকোজ্জ্বল রাস্তা দিয়ে ওরা ধর্মতলা হয়ে ওয়েলিংটনের দিকে ছুটে চলল। পুরনো আমলের বাড়িগুলো আলোর মালায় আলোকিত। মিঃ কাপাডিয়ার বাড়ির দরজায় বেল বাজাতে, দরজা খুলে দিল একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা। মিঃ কাপাডিয়ার নাম বলতেই সে জানাল, "এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন মিঃ কাপাডিয়া।"

"কোন দিকে?" সায়ন প্রশ্ন করল।

"ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে।"

"এত রাতে? তুমি কী করে জানলে উনি ওদিকে গিয়েছেন?"

"বাড়ির ফোন বেজে উঠেছিল। তাই ওঁকে ডাকবার জন্য আমি ওঁর পিছন-পিছন কিছু দূর গিয়েছিলাম। কিন্তু ওঁকে ধরতে পারিনি। নিশি পাওয়া মানুষের মতো হনহন করে উনি এগিয়ে গেলেন।"

কী আশ্চর্য রহস্যময় মানুষ এই কাপাডিয়া! ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ওঁর এখন কী কাজ থাকতে পারে? সায়ন তাড়াতাড়ি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল। রাস্তায় আনন্দমুখর জনতার ভিড়, সেই ভিড় সরিয়ে গাড়ি এগোল। কিছু দূর এগিয়ে রাস্তা ফাঁকা পাওয়া গেল। এখানে রাস্তার আলো নেভানো।

"ওই যে, কাপাডিয়া যাচ্ছেন!" অয়ন চেঁচিয়ে উঠল।

সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন এক শার্ট-প্যান্ট পরা দীর্ঘ ঋজু মূর্তি। তাঁর পিছন-পিছন সাহেবি পোশাক পরা আর-এক মূর্তি। দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে অনুসরণ করছেন সন্দেহ নেই। দূর থেকে প্রথমজনকে চেনা যায় না। সায়ন বলল, "চল, গাড়ি থেকে নেমে ওদের পিছন-পিছন যাওয়া যাক।"

"দ্বিতীয়জন তো কাপাডিয়া, বেঁটেখাটো চেহারা। প্রথমজন কে?"

"সম্ভবত প্রোফেসর হিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'জনে কোথায় যাচ্ছেন কে জানে!"

"ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কোথা থেকে উদয় হলেন?"

"সেটাই তো রহস্য।"

এখানে বলে রাখা ভাল, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রোফেসর। এদিকে ওরা চিতাবাঘের মতো নিঃশব্দ গতিতে, শিকারি ঈগলের মতো শিকারের পিছনে ধাওয়া করল। হনহন করে হেঁটে যাচ্ছেন কাপাডিয়া, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়ামূর্তি যেন আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

"অয়ন! দৌড় লাগা!"

সায়নের চিৎকার শুনে অয়ন দৌড় লাগাল। ততক্ষণে কাপাডিয়ার দেহ খোলা হাইড্রেনের ভিতর তলিয়ে যাচ্ছে। উনি আর্তনাদ করছেন। অন্ধকার রাস্তা, চারদিক নিস্তব্ধ। ওরা আপশোস করতে লাগল, কাপাডিয়াকে বাঁচাতে পারল না বলে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়ামূর্তি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

সায়ন মোবাইলে পুলিশকে দুর্ঘটনার কথা জানাল। এটা বোঝা গেল, কাপাডিয়াকে আর জীবন্ত পাওয়া যাবে না। পুলিশে খবরটা জানিয়ে ওরা দু'জন বিষণ্ণ মনে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

পরদিন সকালে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেল। ওঁর ঘর থেকে পচা গন্ধ বের হচ্ছিল দেখে, কাজের লোকরা খুঁজে বের করল, একটা বড় কাঠের প্যাকিং বাক্সের মধ্যে প্রোফেসর ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃতদেহ জড়িয়ে শুয়ে আছে সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো মমি।

ছবি: স্বপন দেবনাথ

যুদ্ধ ফেরত বাঞ্ছাদা

সুব্রত ভট্টাচার্য

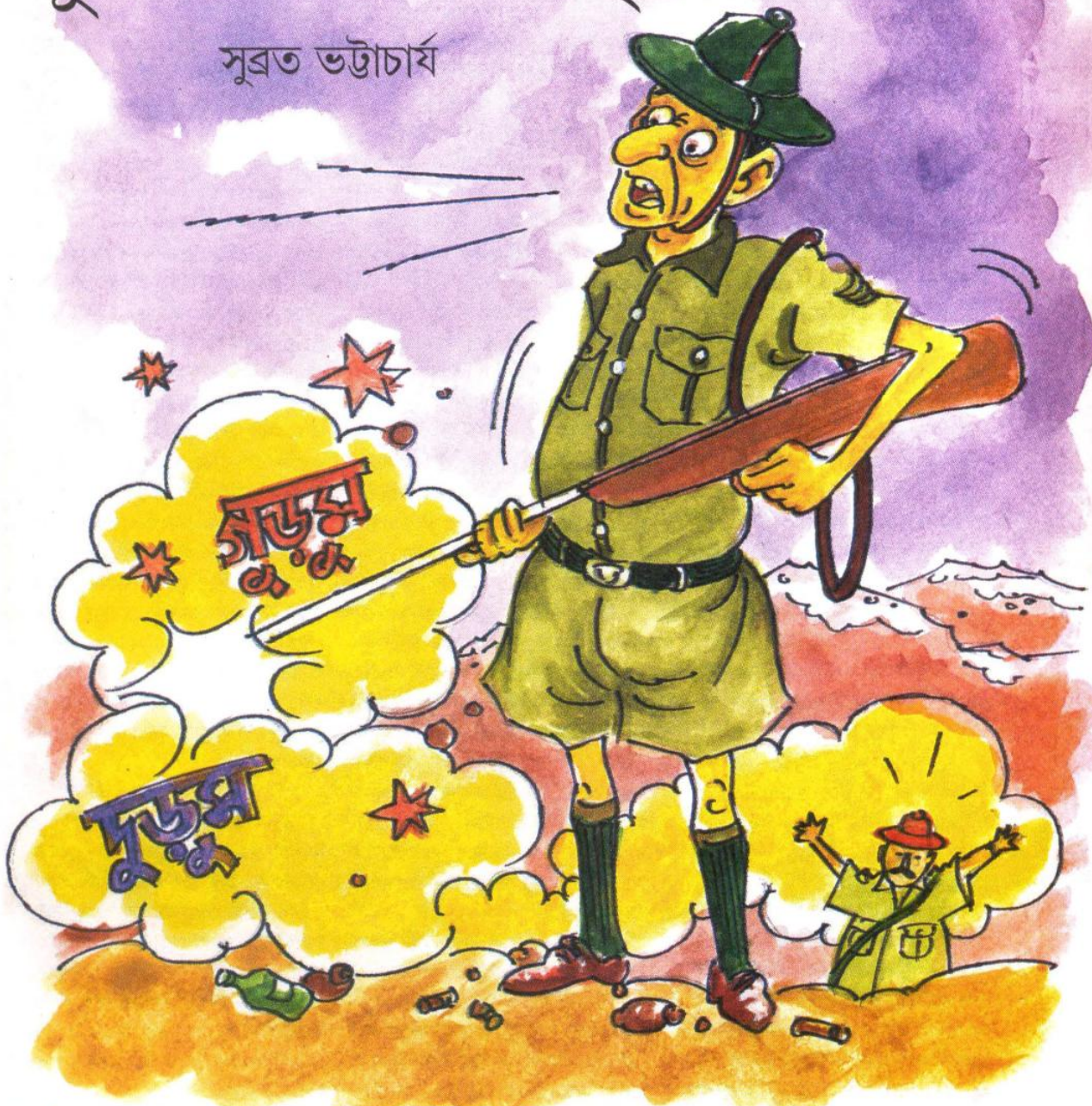

বাঞ্ছাদা একলাই রোয়াকে বসে আছেন। ওঁর বন্ধুরা কেউ এখনও এসে পৌঁছননি। পিছন ফিরে তাকাতেই বাঞ্ছাদা দেখলেন, দত্তবাড়ির শানু দত্ত পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাই উনি শানু দত্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে পড়লে যে! বাড়িতে কোনও কাজ আছে নাকি?"

শানু দত্ত বসতে-বসতে বললেন, "না, বাড়িতে কোনও কাজ নেই ঠিকই, কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব কি না ভাবছিলাম।"

বাঞ্ছাদা শানু দত্তের দিকে ভালভাবে তাকিয়ে বললেন, "ভাববার কিছু নেই। তুমি নিশ্চিন্তে জিজ্ঞেস করতে পার।"

শানু দত্ত বললেন, "আচ্ছা, ওই যে বড়-বড় দেশের সঙ্গে ছোট দেশগুলোর যুদ্ধ হচ্ছে, এ-ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি একটু জানতে পারি?"

বাঞ্ছাদা হাসতে-হাসতে মুখে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে বললেন, "ফুঃ, এটা আবার যুদ্ধ! সবটাই ক্ষমতা দেখাবার হম্বিতম্বি। ভয় দেখিয়ে যতটা পারা যায় আদায় করে নেওয়া। এসব আবার যুদ্ধ? যুদ্ধ করেছি বটে আমরা!"

ইতিমধ্যে বিমলবাবু, নবেন্দুবাবুরাও

রোজকার মতো এসে হাজির হয়েছেন। বাঞ্ছাদার কথাটা শেষ হতে না-হতেই নবেন্দুবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "আপনি যুদ্ধও করেছেন?"

বাঞ্ছাদা নবেন্দুবাবুর কথা শুনে বললেন, "যুদ্ধ করেছি মানে! সে কি এরকম যুদ্ধ! একেবারে প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধ। গোলাগুলির মাঝে দিনের পর-দিন, রাতের পর-রাত কাটিয়ে এসেছে তোমাদের এই বাঞ্ছাদা। বিপক্ষের গুলিতে কখন যে কার প্রাণটা ফুস করে উবে যাবে, কেউ কখনও ভাববার সময় পর্যন্ত পেত না। আর তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ, আমি যুদ্ধ করেছি কিনা!"

বিমলবাবু বললেন, "ওর কথা বাদ দিন! আজ বরং এই যুদ্ধ-যুদ্ধ হাওয়ায় ভেসে, আপনার যুদ্ধ করার গল্পটাই আমাদের বলুন।"

বাঞ্ছাদা ভুরু কুঁচকে বললেন, "গল্প কেন বলছ! একেবারে সত্যি ঘটনা। বলতে পার যুদ্ধক্ষেত্রের রিপোর্ট।"

বিমলবাবু বললেন, "সেই রিপোর্টটাই আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করে আজ আমাদের একটু সমৃদ্ধ করুন।"

বাঞ্ছাদা একবার বিমলবাবুর দিকে, আর-একবার নবেন্দুবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তা তোমরা কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই শুনবে?"

নবেন্দুবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনার রিপোর্টিং কি কখনও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শোনা যায়, না শোনা উচিত?" তিনি বসে পড়ে বললেন, "নিন, শুরু করুন।"

বাঞ্ছাদা একটা পান মুখে পুরে বললেন, "সেটা বোধ হয় উনিশশো চল্লিশ সালটাল হবে। সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। সময় কাটাবার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই। এদিকে বাড়িতে বড়দের আলোচনায় শুনতে পাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। অল্পবয়সি ছেলে দেখলেই লালমুখো ইংরেজরা তুলে নিয়ে গিয়ে মিলিটারিতে ভর্তি করে নিচ্ছে। তাই বড়দের বারণ, খুব একটা দূরে গিয়ে যেন ঘোরাঘুরি না করি। কিন্তু বয়সের ধর্ম কেউ কি উপেক্ষা করতে পারে? যখন যেখানে ইচ্ছে হয় বেরিয়ে যাই। বড়দের বারণে কি আর আটকে থাকতে ইচ্ছে করে?

"তা, এরকমই একদিন রেড রোড দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ফোর্ট উইলিয়ামের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছি, হঠাৎই এক দীর্ঘকায় লালমুখো সাহেব আমার উদ্দেশে হাত তুলে 'হ্যালো ইয়াংম্যান, হ্যালো ইয়াংম্যান' বলে চিৎকার করছে শুনে থেমে গেলাম। তারপর কী মনে করে দু' পা এগিয়েছি, অমনি দৌড়তে-দৌড়তে সেই সাহেব একেবারে আমার সামনে এসে হাজির। এসেই আমাকে ভালভাবে জরিপ করতে শুরু করল। আমাকে ওভাবে সাহেব দেখছে বলে আমি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী দরকার বলুন?'

"সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বলল, 'গুড, ভেরি গুড! আমার সঙ্গে চলো।' বলেই সাহেব আমার হাতের নড়া ধরে আমাকে ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে নিয়ে চলল।"

বিমলবাবু বললেন, "বাঞ্ছাদা, কিছু মনে করবেন না। আমি বলছি কী, মিলিটারিতে তো বেশ লম্বা-চওড়া আর খুব ভাল স্বাস্থ্য না হলে সোলজার হিসেবে নেয় না। আপনার স্বাস্থ্য কিন্তু..."

নবেন্দুবাবু বিমলবাবুর কথার মাঝখানে বললেন, "আরে, মিলিটারিতে কি শুধু সোলজারই দরকার হয়? আমি তো জানি, ওখানে ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে মায় রাঁধুনি পর্যন্ত দরকার হয়।"

বাঞ্ছাদা নবেন্দুবাবুর দিকে বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুমি কি আমাকে ইয়াং বয়সে দেখেছ যে, ওরকম মন্তব্য করছ? আমার অল্প বয়সের লম্বা-চওড়া চেহারা দেখলে তোমরা মাথা ঘুরে পড়ে যেতে!"

বিমলবাবু বললেন, "আসলে উনি ঠিক আপনাকে ওই কথাগুলো বলতে চাননি। আমার কথার প্রসঙ্গে বলছিলেন আরকী। আপনি বলুন। আমরা এই চুপ করলাম।"

বাঞ্ছাদা বললেন, "ব্যাপারটা কী জানো, কোনও কিছু বলার মাঝখানে এরকম উদ্ভট কথা শুনলে চিন্তার খেই হারিয়ে যায়, আর বেশ অসুবিধে হয়। তাই তোমাদের মাঝে-মাঝে মনে করিয়ে দিই, কথার মাঝখানে কেউ কথা বলবে না! যা জিজ্ঞেস করবার থাকে, একদম শেষে করবে।"

নবেন্দুবাবু বললেন, "আমার ঘাট হয়েছে বাঞ্ছাদা, আপনাকে আর খেই হারাতে হবে না। আমরা চুপ করে থাকব। আপনি শুরু করুন।"

বাঞ্ছাদা ডিবে থেকে একটা পান বের করে মুখে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমাকে তো ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরে নিয়ে গিয়ে সেই সাহেব একদল মিলিটারি অফিসারের সামনে দাঁড় করিয়ে ওদের কানে-কানে কী সব বলতে লাগল। তারপর একজন সাহেব এসে আমার পিঠ চাপড়ে নিয়ে গেল একজন ডাক্তারের সামনে। ডাক্তার চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে বসতে বললেন। ডাক্তারবাবু খুব সম্ভবত বাঙালি ছিলেন। কিংবা বাংলায় দীর্ঘদিন থেকে বাংলা ভাষাটা একটুআধটু রপ্ত করেছিলেন। উনি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় আমাকে খালি গা হতে বললেন। আমি খালি গা হয়ে দাঁড়াতেই, ডাক্তারবাবু আমার বুক, পিঠ, চোখ ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর আমাকে 'ভেরি গুড' বলে মিলিটারি অফিসারদের হাতে তুলে দিলেন। আমিও ওদের হাতের পুতুল হয়ে যে যা করতে বলছে তাই করতে থাকলাম। এদিকে খিদেয় আমার পেটে ছুঁচো দৌড়চ্ছে। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে একজন সাহেব আমাকে ওদের খাবার টেবিলে নিয়ে গিয়ে একরাশ খাবারের মধ্যে বসিয়ে দিল। যা থাকে কপালে ভেবে, আমি খাবার খেতে শুরু করলাম।

"তার পরের দিন থেকে শুরু হল মিলিটারি ট্রেনিং। ভোর না হতেই দৌড়ঝাঁপ, রাইফেল শুটিং। বিকেলে কখনও দড়ি বেয়ে উপরে ওঠা, হাই জাম্প, লং জাম্প ইত্যাদি। শরীরটাকে নিয়ে একেবারে টানাহ্যাঁচড়া ব্যাপার আরকী! এ সমস্ত কী পোষায়! দিব্যি ঘরের খেয়ে ঘুরে বেড়িয়ে দিন কাটছিল। এ আবার কাদের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! এদিকে বাড়িতেও তো কিছু জানানো হয়নি। একদিন সন্ধেবেলা বসে-বসে এই সব ভাবছি। হঠাৎই একজন মিলিটারি অফিসার এসে আমাকে বলল, 'আপনার বাবার নাম ও বাড়ির ঠিকানা দিন। আপনার বাড়িতে আমরা জানিয়ে দেব।'

"বাবার নাম ও বাড়ির ঠিকানা দেওয়ার পরদিনই ওরা আমাকে ও আরও একদল ছেলেকে নিয়ে অজানার উদ্দেশে রওনা

গল্প

দিল। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কোন দেশের উপর দিয়ে যাচ্ছি, তার কিছুই বুঝতে পারছি না। চলেছি তো চলেছি। এভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন গিয়ে থামলাম খুব ঠান্ডা একটা জায়গায়। গোটা জায়গাটাই যেন বরফে ঢাকা, আর বরফ থেকে সব সময় যেন ধোঁয়া উঠছে। তেমনই কনকনে ঠান্ডাও বটে! যেন হাড়ে গিয়ে ঠেকছে।

"আমাদের কমান্ডার বলল, 'তোমরা এই ঠান্ডায় কিন্তু একদম জমে যাবে। আমি এই পোশাকগুলো তোমাদের দিচ্ছি, এগুলো পরে নাও।' তারপর নীচের দিকে একটা ছাউনি দেখিয়ে বলল, 'ওই ছাউনিতে রয়েছে আমাদের শত্রুপক্ষের সৈন্যরা। ওরা কিন্তু সংখ্যায় এবং অস্ত্রে আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। ওই ছাউনির সৈন্যদের হটিয়ে দেওয়াই এখন আমাদের কাজ। ওরা যদি একবারও টের পায় আমরা উপরে এসে গিয়েছি, তা হলে নীচ থেকে গোলাবর্ষণ করে, কিংবা ডিনামাইট চার্জ করে আমাদের একজনকেও জীবিত ফিরতে দেবে না। তাই সাবধান! আজ রাতের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে হোক বা গড়িয়ে পড়ে হোক, ওদের তাঁবুর কাছে পৌঁছে ওদের হটাতেই হবে।' কমান্ডার এই আদেশ দিয়ে আমাদের চুপচাপ থাকতে বলল।

"সময় যেন আর কাটে না। সবে তো দুপুর গড়িয়ে বিকেল নাগাদ আমরা পৌঁছেছি। সবাই যে যার গরম পোশাক পরে আর রাইফেল হাতে নিয়ে রাতের অপেক্ষায় নিঃশব্দে বসে। হঠাৎই একজন সৈন্যের কাঁপুনি শুরু হল। কমান্ডার সাহেব একের পর-এক ভেড়ার লোমের কম্বল চাপা দিয়ে কিছু ওষুধ খাইয়ে দিল। কিন্তু প্রচণ্ড জ্বরে সব চেষ্টা ব্যর্থ করে, আমাদের সেই সৈনিকভাই নেতিয়ে পড়ল। সাহেব আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করে আস্তে-আস্তে ওর মুখের উপর কম্বলটা টেনে দিয়ে ওকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিল।

"তার পর আমাদের কিছু ঝলসানো মাংস আর রুটি দিয়ে বসিয়ে দিল। তখন কোনও কিছুই আমাদের গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। তবুও খাচ্ছি আর ভাবছি, কতক্ষণে এই অপারেশন শেষ করে আমরা এখান থেকে পালাব। আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে কমান্ডার মজার-মজার গল্প আস্তে-আস্তে বলতে থাকল। কিন্তু, বিপদ যখন আসে, সে আর সময় দিয়ে আসে না! খেতে-খেতে হঠাৎ তিনজন সৈন্যের বমি শুরু হল। একবার এর কাছে কমান্ডার ছুটে যায় তো আর একজনের ওয়াক তোলা শুরু হয়। দৌড়োদৌড়ি করে সাহেবের তো নাজেহাল অবস্থা। যত রকম ওষুধ ছিল সব ব্যবহার করেও ওই তিনজনকে আমরা হারালাম। কমান্ডারের মুখ একদম থমথমে। আমি আর জনা পাঁচেক সুস্থ থেকে তখনও সাহেবের সঙ্গী হয়ে আছি। এদিকে অন্ধকার নেমে এল। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। সাহেব আমাদের কানে-কানে বলল, 'এই অপারেশনটা ঠিকমতো করতে পারলেই আমাদেরও কমান্ডার করে দেওয়া হবে। বিশাল উন্নতি। কোনও ভয় নেই। তোমরা এগিয়ে যাও!'

"কিন্তু কোথায় এগবো! যেমন ঠান্ডা, তেমনি গাঢ় অন্ধকার! শুধু শত্রু ছাউনিতে টিমটিম করছে আলোর আভাস। কিছুক্ষণ পরে তাও নিভে গেল। কমান্ডার আমাদের দাঁড় করিয়ে বলল, 'তোমরা এইদিক বরাবর হেঁটে অথবা গড়িয়ে নেমে পড়ো।'

"আমার সঙ্গী সৈন্যরা কে কী অবস্থায় ছিল, আমার খেয়াল নেই। আমি এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে বসতে গিয়ে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি শত্রুপক্ষের তাঁবুর কাছে পৌঁছে গেলাম। তাঁবুর কাছাকাছি আসতেই শত্রুপক্ষ টের পেয়ে বাঁশি বাজাতে শুরু করল। সকলে সতর্ক হয়ে রাইফেল উঁচিয়ে বেরিয়ে পড়বার আগেই আমি চোখকান বুজে রাইফেলে যে ক'টা গুলি ছিল, সব ক'টা ওই শত্রুপক্ষের তাঁবুর দিকে তাক করে চালিয়ে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম।

"তার পর শুরু হল বীভৎস সব আওয়াজ। দুমদুম, গুড়ুম-গুড়ুম আওয়াজে আকাশ-বাতাস ভরে গেল। ওদের বারুদে আগুন লেগে সব কিছু দাউদাউ করে জ্বলে উঠে একটা বীভৎস লীলা শুরু হল। সেই শব্দে আমি জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান ফিরল কমান্ডারের ডাকে। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে ফেলে আবার উপরে নিয়ে এল। কিন্তু তখন আমার অবস্থা খুব খারাপ। বেশ জোরে পেট কামড়ানো শুরু হল। বারবার পোশাক পালটেও ঠিক থাকতে পারছি না। বাইরে যাচ্ছি আর আসছি। কিছুক্ষণ পরে আমি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ভোরবেলা চোখ মেলে দেখি, আমি একটা মিলিটারি হসপিটালে। স্যালাইন চলছে। অক্সিজেন সিলিন্ডারটা তখনও পাশে। ওখানকার একজন ডাক্তার দৌড়ে এসে একজন নার্সকে বললেন, 'যাক, মিস্টার বাঞ্ছারাম গড়গড়ি তা হলে এ-যাত্রায় বেঁচে গেলেন। সাধারণত, এরকম হিল ডাইরিয়ার পেশেন্টরা প্রাণ ফিরে পায় না। তবে ওঁর সুস্থ হতে অনেক সময় লাগবে। এই অবস্থায় ওঁর আর মিলিটারিতে থাকা সম্ভব নয়।'

"ডাক্তার রিলিজ় অর্ডার এবং এই চাকরিতে অনুপযুক্ত সার্টিফিকেট দিয়ে আমাকে রেহাই দিলেন। তারপর ওরা আমাকে আবার ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে এল। ওখানে বিরাট সংবর্ধনার ব্যবস্থা করে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।"

বিমলবাবু বললেন, "আচ্ছা বাঞ্ছাদা, ওই যে ঠান্ডা জায়গাটার কথা বলছিলেন, ওটা কি নেফা বা লাদাখ? আর আপনি শত্রুপক্ষকে আক্রমণের সময় একা-একা ঘোরাঘুরিই বা করছিলেন কেন?"

বাঞ্ছাদা বললেন, "হবে হয়তো নেফা বা লাদাখ। কেননা, কমান্ডারের মুখে ওরকমই যেন কিছু শুনছিলাম। ওদের কথা তো স্পষ্ট বোঝা যায় না। অর্ধেক মুখে আর অর্ধেক পেটে থাকে।ঘোরাঘুরি করছিলাম কী আর সাধে! আসলে তখন থেকেই আমার পেটে হিল ডাইরিয়ার অ্যাকশন শুরু হয়ে গিয়েছিল যে! ওই ঘটনা না ঘটলে তোমাদের বাঞ্ছাদাকে তোমরা আর এই রোয়াকে পেতে না। মেজর জেনারেল-টেনারেল হয়ে খবরের শিরোনামে জ্বলজ্বল করতাম! এখন তো শুধু কাঁচকলা, গাঁদাল পাতার ঝোল ছাড়া পেটে কিছু সহ্য হয় না। তবে সেই সময়ের সোনালি দিনগুলোর কথা ভেবেই আজও বেঁচে আছি। এই দ্যাখো, এখন আবার পেটটা কামড়াতে শুরু করল। আজ তা হলে চলি!" বাঞ্ছাদা বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

ছবি: সুদীপ্ত মণ্ডল

অমিল খোঁজো

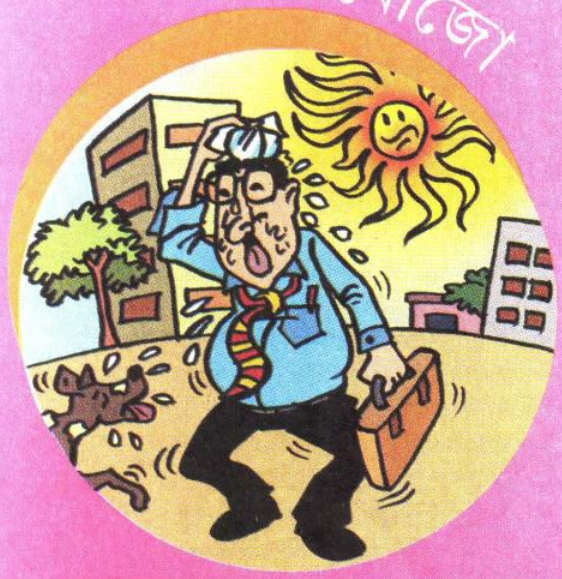

তফাত বোঝো

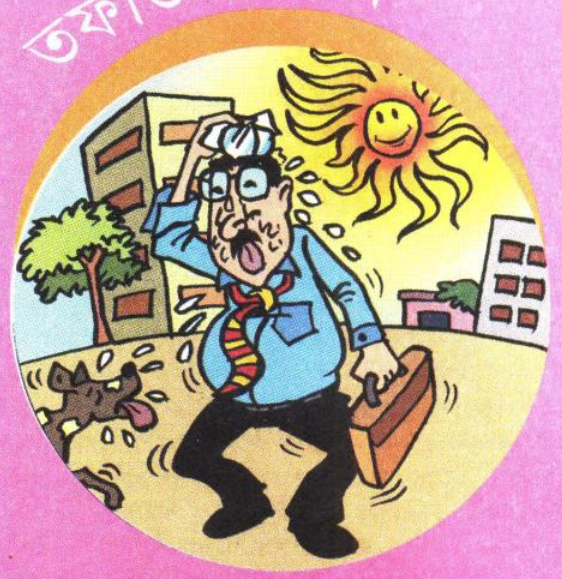

উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শেষ দিন ছাত্রছাত্রীরা দিদিমণির জন্য নানা উপহার নিয়ে এসেছে। ফুলবিক্রেতার ছেলে একটি বড় প্যাকেট দিদিমণির হাতে তুলে দিল। দিদিমণি প্যাকেটটা নাড়িয়ে বললেন, "গোলাপ ফুল?"

ছাত্রটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী করে জানলেন?"

দিদিমণি বললেন, "আমার আন্দাজ কখনও ভুল হয় না।"

এরপর একজন মিষ্টিবিক্রেতার মেয়ে একটি বড় প্যাকেট নিয়ে হাজির।

দিদিমণি প্যাকেটটা নাড়িয়ে বললেন, "লাড্ডু?"

এই ছাত্রীটিও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী করে জানলেন?"

দিদিমণি বললেন, "বললাম না, আমার আন্দাজ কখনও ভুল হয় না।"

তৃতীয় ছাত্রটি ছিল ফলের রসবিক্রেতার ছেলে। তার হাত থেকে প্যাকেট নিয়ে নাড়াতেই ফোঁটা-ফোঁটা তরল পদার্থ গড়াতে শুরু করল। দিদিমণি আঙুলে করে সেটার স্বাদ নিয়ে বললেন, "কমলালেবুর রস?"

ছাত্রটি মাথা নেড়ে না বলল। দিদিমণি আর-একবার স্বাদ নিয়ে বললেন, "আনারসের রস?"

ছাত্রটি আবার মাথা নেড়ে না বলল। দিদিমণি আবার স্বাদ নিলেন, কিন্তু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী আছে এর ভিতরে?"

ছাত্রটি মিষ্টি হেসে বলল, "কুকুর ছানা।"

পুঁচকির খুব পেট ব্যথা। তার মা বললেন, "নিশ্চয়ই তোমার পেট একদম খালি। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নাও।" এর পরদিন সকালে পুঁচকির বাবা পুঁচকির মাকে ডেকে বললেন, "আমার খুব মাথা ব্যথা করছে, আজ আর অফিস যাব না।"

পুঁচকি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "তোমার মাথা নিশ্চয়ই একেবারে খালি। তাড়াতাড়ি ওতে কিছু ভরে নাও।"

রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন ভদ্রলোক দেখলেন সামনের বাড়িতে একটি বাচ্চা ছেলে অনেক কষ্ট করেও ডোর বেলে হাত পাচ্ছে না। তিনি গিয়ে বেলটা বাজিয়ে দিলেন। তারপর হেসে বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার জন্য আর কিছু করতে পারি?"

"না, তবে নিজের জন্য এবার জোরে দৌড় লাগান।"

তিনটি মেয়েকে স্কুলের দরোয়ান প্রধানশিক্ষিকার ঘরে নিয়ে এসেছে। প্রধানশিক্ষিকা বললেন, "তোমাদের নাম, আর কী করেছ আমাকে একে-একে বলো।"

প্রথম জন বলল, "আমার নাম সোমা। আমি মোমের প্যাকেট ছিঁড়ে ফেলেছি।"

দ্বিতীয় জন বলল, "আমার নাম রীতা। আমি মোমের প্যাকেট ছিঁড়ে ফেলেছি।"

তৃতীয় জন বলল, "আমার নাম মোম। রং পেনসিলের প্যাকেটটা আমার।

অর্থ শেখো

বই যত বেশি পড়া যাবে, ততই নতুন-নতুন শব্দ আয়ত্ত হবে। শুধু ইশকুলের পাঠ্য বই নয়, পড়তে হবে প্রচুর গল্পের বইও। বই পড়তে-পড়তে নতুন শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে তার অর্থও জানা যাবে। নীচের শব্দগুলোর পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটা ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দিতে হবে। তারপর উত্তর মিলিয়ে দেখে নিতে হবে।

বেয়াড়া: (১) অফিসের চাপরাশি। (২) পালকি বাহক। (৩) অদ্ভুত। (৪) বিশ্রী।

বুজরুকি: (১) পাণ্ডিত্য। (২) মুরুব্বিয়ানা। (৩) ভাঁওতা। (৪) মাহাত্ম্য।

উৎকর্ণ: (১) খোদাই করা হয়েছে এমন। (২) উদ্বেগ। (৩) অধীর। (৪) শোনার জন্য ব্যাকুল।

বেঘোরে: (১) বিপন্ন অবস্থায়। (২) অসহায় অবস্থায়। (৩) দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে। (৪) অচেনা জায়গায়।

শ্রীঘর: (১) সাজানো ঘর। (২) সরকারি বাসস্থান। (৩) অপরাধ করলে এখানে যেতে হয়। (৪) কারাগার।

গত সংখ্যার উত্তর

দিকপাল: (২) অত্যন্ত গুণী বা বিখ্যাত (ব্যঙ্গে)। 'বেড়ে উঠে তারা দিকপাল হয়েছে এক-একটা।' (শিবরাম)

চাকরান: (৪) বেতনের পরিবর্তে ভৃত্যকে প্রদত্ত জমি। 'চৌধুরীরা চাকরান জমি কেড়ে নিলেন।' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

চক্ষুদান: (৩) চুরি। 'বিন্দি না দেখলে ঝি চক্ষুদান করেছিল আর কি।' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বেমক্কা: (৪) অশোভন। 'দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে ছুটতে লাগল বেমক্কা।' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

প্রত্যাসন্ন: (১) একেবারে নিকটবর্তী। 'রাত জেগে ছেলে পড়ে অবিশ্রান্ত উচ্চৈস্বরে প্রত্যাসন্ন পরীক্ষার পড়া।' (কবি কালিদাস রায়)

স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) লোকটার চশমার রং বদলে গিয়েছে। (২) লোকটার জামার পকেটে কলম নেই। (৩) ব্যাগের ডিজ়াইন আলাদা। (৪) গোঁফের ডিজ়াইন আলাদা। (৫) সূর্যের মুখের ভঙ্গি পাল্টে গিয়েছে। (৬) কুকুরের জিভ বেশি বেরিয়ে আছে। (৭) ডান দিকের গাছের অংশ কম দেখা যাচ্ছে। (৮) কুকুরটার পায়ের অংশ কম দেখা যাচ্ছে।

সংকেত: পাশাপাশি

(১) অসতর্ক, অমনোযোগী। (৪) শ্রীচৈতন্য। (৬) যার মা বেঁচে নেই। (৮) রকম, প্রকার। (১০) কাদায় ভরা। (১১) বিষ্ণু। (১২) 'এ ধরনিতল কঠিন—এ নহে তোমার শয্যা।' (১৩) কষ্ট, বেদনা। (১৫) ভাগ্য, অদৃষ্ট, ফরমাশ। (১৭) রামায়ণে লক্ষ্মণের জননী। (১৮) ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির লোম, উল। (১৯) লম্বাটে, ছিপছিপে। (২০) আমাদের প্রিয় শহর। (২১) ভীষণ, ভয়ানক।

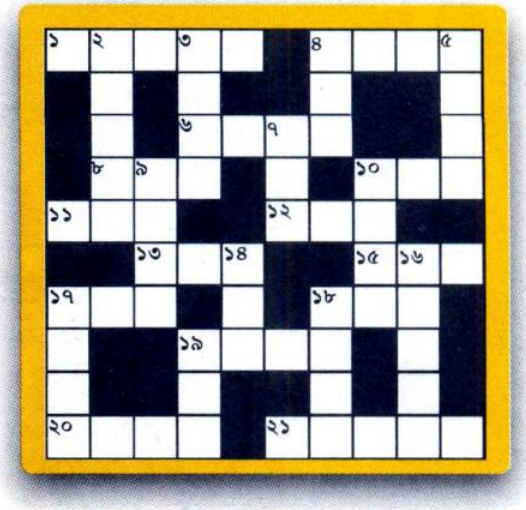

সংকেত: উপর-নীচ

(২) সবিশেষ অনুরোধ, সাধাসাধি। (৩) দৌড়চ্ছে এমন। (৪) লুকনো, গুপ্ত। (৫) পক্ষের লোকজন, সাঙ্গোপাঙ্গ। (৭) উজ্জ্বল ও মূল্যবান রত্ন, হিরে। (৯) জগন্নাথদেবের রথে ভ্রমণ উৎসব। (১০) অপরের অধীন, পরাধীন। (১৪) নৌকো বা জাহাজ চালায় যে। (১৬) ইন্দ্রধনু, বৃষ্টির পরে আকাশে বিরাট ধনুকাকৃতি বিচিত্র বর্ণের যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়। (১৭) স্বর্গ। (১৮) হার। (১৯) ঐক্য, —ই বল।

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

পুজোয় ফেলুদার সঙ্গে পাহাড়ে...

ফেলুদার রঙিন কমিক্স
এছাড়াও উপন্যাস • বড়গল্প • কমিক্স • কুইজ়
ছড়া-কবিতা • জ্ঞান-বিজ্ঞান • খেলাধুলো..পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা
মানেই রহস্য-রোমাঞ্চ, আনন্দ-ফুর্তিতে ভরা জমজমাট দুনিয়া।

পূজাবার্ষিকী ১৪১৩
৭৫
আনন্দমেলা
তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী।

রোমে গেল বিশ্বকাপ

শুধুই কি জেদ একটা টিমকে এত বড় সাফল্য এনে দেয়? শুধু জেদ দিয়েই পিছনে ফেলা যায়, রোনাল্ডো, ফিগো, জিদান, বেকহ্যামদের মতো মহাতারকাদের দেশকে? লিখেছেন সন্দীপ দাশগুপ্ত

ইতালির আকাশ কখনও কালো, কখনও নীল। সে দিনটা নিশ্চয়ই ভোলেননি মারসেলো লিপ্পি। যেদিন তাঁর ছেলে ডেভিড, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন, তার ক'দিন পর শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। অথচ চুরির দায়ে অভিযুক্ত কিনা ইতালির বিশ্বকাপ-ব্যান্ডমাস্টারের পুত্র! ম্যাচ গড়াপেটা করাটা চুরি নয়তো কী? লিপ্পিকেও ছাড়েননি বিচারকেরা। তাঁর কোচিংয়ে এক সময় জুভেন্তাস ইতালির সেরি 'এ' খেতাব তুলে নিয়েছে। একবার নয়, পাঁচ-পাঁচবার। তাঁর কোচিংয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে জুভেন্তাস। অনেক-অনেক পালক মানুষটির মুকুটে। কিন্তু তাঁকেও অস্বস্তিতে রাখলেন বিচারকরা। সন্দেহের তির তাঁর দিকেও। বিশ্বকাপের ঠিক আগেও কাগজে প্রায়ই হেডলাইন বেরিয়েছে, লিপ্পিও ধোয়াতুলসী নন। অনেক ক্লাব আর কর্তার সঙ্গে, ইতালীয় ফুটবলের বৃহত্তম কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে আছেন তাঁদের জাতীয় কোচও! ষাট ছুঁইছুঁই লোকটার ভেঙে পড়ার কথা। হয়তো পড়েও ছিলেন। যে-কোনও দুর্বল মানুষ এমনটা হলে সব ছেড়েছুড়ে বনবাসে চলে যেতেন। লিপ্পি কিন্তু থেকে গেলেন। ভাবখানা এরকম, আর ক'টা দিনের তো ব্যাপার! দেখি না শেষটা। ধন্য ইতালির ফুটবল ফেডারেশনও। তারাও কিন্তু মত পালটায়নি। বরং তাঁকে বুঝিয়েছে, আপনিই সেরা মানুষ। ফুটবল স্ট্র্যাটেজিতে আপনার ধারেকাছে কেউ নেই। স্কোলারি, দমিনিক, পাহিরাদের আপনিই পারেন পিছনের দরজা দেখাতে। আপনিই যাবেন জার্মানি।

পাওলো রোসির মতো পোড় খাওয়া কেউ-কেউ যখন লিখছিলেন, আগামী চার বছর বিশ্বকাপের ঠিকানা হতে যাচ্ছে রোম, তখনও কেউ পাত্তা দেয়নি। যাঁদের নিজেদের ফুটবলেই এত ঝুটঝামেলা, তাঁদের কাপ জেতার স্বপ্নকে সারবত্তাহীন ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেছিল অনেকেই। রোসির টেকনিক্যাল বিশ্লেষণকে 'কচকচানি' বলে অবহেলাও করা হয়েছে। রোসি অবশ্য একটা কথা লেখেননি, তাঁদের ফুটবলারদের পিঠ এখন দেওয়ালে। দেশের মানুষের কাছে নিজেদের ইমেজ ঠিকঠাক রাখার একটাই উপায়। বিশ্বকাপটা নিয়ে দেশে ফেরা। তাই ব্রাজিল থেকে ফ্রান্স—যতই বড়-বড় নাম ভেসে উঠুক, এবার ইতালীয়দের চেয়ে মরিয়া আর কোনও দেশ নয়। আশপাশে এত তারকা বলেই হয়তো ফুটবল বিশ্লেষকদের কাছেও এই ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাচ্ছিল। এই যে মাতারাৎজি কাপ ফাইনালের দিন জিদানের মাথাটা গরম করে দিয়ে দিনের সেরা স্ট্রোকটা মারলেন, সেটাও হয়তো সেই মরিয়াপনার প্রকাশ। অনেকে বলছেন, এখানেই টিম-ইতালির পুনর্জন্ম!

কিন্তু শুধুই কি জেদ একটা টিমকে এত বড় সাফল্য এনে দেয়? শুধু জেদ দিয়েই পিছনে ফেলা যায়, রোনাল্ডো, ফিগো, জিদান, বেকহ্যামদের মতো মহাতারকাদের দেশকে? এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়েছেন এঞ্জো বেয়ারজোত। এবারের আগে ইতালিকে শেষ বিশ্বকাপ এনে দেওয়া টিমের কোচ সোজাসুজি বলছেন, "না। শুধু জেদ দিয়ে হয় না। লাগে অবিশ্বাস্য ট্যাকটিক্যাল বুদ্ধি।" বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর দেখছি, সেটাই খুঁজতে বসেছেন ফুটবল পণ্ডিতেরা।

কেন, কার বুদ্ধিতে কানাভোরার ডিফেন্স আসলে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির শিল্প? কেন মাতারাৎজির মতো ফুটবলার এসে মেরে দিলেন জিনেদিন জিদান নামক ফুটবল-বিস্ময়কে? প্লেয়ার বদলে কোথায়-কোথায় আলাদা ইতালি? জার্মানির বিরুদ্ধে কোন অসমসাহসীর বুদ্ধিতে দেখা গেল অবিশ্বাস্য সব ফুটবলার বদল? কার ম্যাজিকে গিরগিটির খোলসের মতো আক্রমণের জামা বারবার পালটে ফেলছিল আজ্জুরি? যা বুঝতে ভিরমি খেয়ে গেলেন ক্লিন্সম্যানের মতো কোচও। কোন জাদুতে গোটা টুর্নামেন্টে মাত্র দু'টো গোল খেল ইতালি? এমন তো নয়, বুঁফোর মতো এগারো জন বিশ্বসেরা নিয়ে তারা নেমেছিল! যেখানে তোত্তি, দেল পিয়েরোদের ভুলেও কেউ রোনাল্ডিনহোদের বেঞ্চে জায়গা দেননি! তিনি কে? উত্তর একটাই। তিনি মারসেলো লিপ্পি। শুধু এই একটা মানুষের বুদ্ধির কাছেই হার মানল ফুটবল দুনিয়া। সাধে প্লাতিনি বলেননি, "এই বিশ্বকাপটা কোচদের।" আরও স্পষ্ট করে প্লাতিনি বলতে পারতেন, এই বিশ্বকাপটা আজ্জুরি-কোচের। অবশ্য তিনি না বললেও কিছু আসে যায় না। এত দিনে সকলে জেনে গিয়েছে, বিশ্বকাপের পর ইতালির আকাশ আবার নীল। তা যতই ফিরে আসুক বেটিং বিতর্ক। শুধু যাঁর জন্য নীল, তিনি থাকছেন না। সমালোচকদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে তিনি চলে যাচ্ছেন বিশ্রামে। সম্ভবত আর কখনও রিজার্ভ বেঞ্চে চুরুট মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মারসেলো লিপ্পিকে দেখা যাবে না!

টিম ইন্ডিয়া

দীর্ঘ ৩৫ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ জেতার পর রাহুল দ্রাবিড় সম্পর্কে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের কোচ গ্রেগ চ্যাপেল মন্তব্য করেন, "অবসরের দিন পর্যন্ত উন্নতি করে যাবে রাহুল দ্রাবিড়।" যদিও কেউ-কেউ দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে এই সিরিজ জেতার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব দেখছেন না। যদি তাই হয়, তা হলে এই দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে ভারত কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোনও দুর্বল টিমের সঙ্গে খেলেনি? নাকি হারাতে পারেনি? কিন্তু দ্রাবিড় তা করে দেখিয়েছেন।

দুই ভূমিকায় সফল দ্রাবিড়

দুই অধিনায়ক

আমরা সকলে জানি, ফুটবলে অধিনায়কের ভূমিকা ততটা গুরুত্ব পায় না, যতটা ক্রিকেটে পায়। কারণ, ফুটবলের ক্ষেত্রে পরিচালনার প্রধান দায়িত্বটাই থাকে কোচের উপর। কিন্তু ক্রিকেটে অধিনায়কের ভূমিকা কয়েকটি শব্দ দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। যদিও দলের সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড়ই যে অধিনায়ক হবেন, এমন কোনও কথা নেই। তবে হ্যাঁ, কিছু জরুরি শর্ত অধিনায়ককে অবশ্যই পালন করতে হয়, যার মধ্যে অন্যতম হল, অধিনায়ক যে বিভাগে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী, সেটা সকলের আগে মন দিয়ে করা। এ ক্ষেত্রে আদর্শ অধিনায়কের কথা বললে মনে আসে ভারতীয় অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের কথাও। কারণ, অধিনায়ক তাঁকেই করা হয়, যিনি তাঁর দায়িত্বের বাইরে আরও বেশি কিছু দিতে পারবেন দলকে। আর রাহুল এক্ষেত্রে নিজের সাধ্যের অনেক-অনেক বেশি কিছু দেন ভারতীয় দলকে। আমরা ভারতের বেশ কিছু ভাল অধিনায়ককে দেখেছি, কিন্তু মনে হয় না তাঁদের মধ্যে কেউ ব্যাটসম্যান রাহুল এবং অধিনায়ক রাহুলের মতো দু'টো ভূমিকাতেই সমানতালে পারফর্ম করতে পেরেছেন। হ্যাঁ, কপিল কিংবা গাওস্করের কথা মাথায় রেখেও এই কথা বলা যেতে পারে।

সফল অধিনায়ক তিনিই, যিনি তাঁর দায়িত্বের বাইরে আরও বেশি কিছু দিতে পারেন দলকে। লিখেছেন অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

যদিও রাহুলের কাছে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব পাওয়া মোটেই সুখকর অনুভূতি ছিল না। প্রচুর বিতর্ক হয়েছিল তাঁর অধিনায়কত্ব নিয়ে। কারণ, ইতিহাস বলছে ভারতের কোনও অধিনায়কই অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর আগের পারফরম্যান্সের ধারেকাছে থাকতে পারেননি, যেখানে সচিন ও সৌরভের অনুপস্থিতিতে দ্রাবিড়ই হলেন ভারতীয় দলের প্রধান ব্যাটিংস্তম্ভ। ইতিহাস যাই বলুক, পরিস্থিতি কিন্তু তা বলছে না। কারণ, পরিসংখ্যান অনুযায়ী দ্রাবিড়ের অধিনায়কত্বে যত ম্যাচ খেলা হয়েছে, সবচেয়ে সফল ধারাবাহিক ব্যাটসম্যানের নাম রাহুল দ্রাবিড়। এমনকী ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে টেস্ট সিরিজে 'ম্যান অফ দ্য সিরিজ' এবং শেষ টেস্টে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' স্বয়ং তিনি। অতএব যাবতীয় বিতর্কের অবসান এবং দ্রাবিড় বিরোধীদের মুখ আপাতত বন্ধ। 'আপাতত' কথাটি এই জন্যই বলছি, কারণ, কোনও একটি ম্যাচে রাহুল ব্যর্থ হলে এরা আবার সরব হয়ে উঠবে। দ্রাবিড়ের বয়স এখন প্রায় ৩৩ বছর। আর তিন-চার বছরের বেশি তিনি হয়তো খেলতেও পারবেন না। কিন্তু ক্রিকেট ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে।

সহবাগ ও অধিনায়ক

ফুটবল

জিদানের জবাব নেই

এক শনিবার ইশকুল থেকে ফিরে দেখি, লিটনদা গোমড়া মুখে বসে আছে। সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে, লিটনদার তো আজ দারুণ মুডে থাকার কথা। কিন্তু এসে ইস্তক দেখছি, লিটনদার মুখে হাসি নেই। কারণটা জিজ্ঞেস করতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল লিটনদা, "মার্কো মাতারাৎজি ঠিক কী বলেছিলেন জিনেদিন জিদানকে? এই প্রশ্নটা কী এখন বিশ্বকাপের ট্রোফির চেয়েও দামি?"

জন্মসূত্রে আলজিরীয় জিদানের অন্ধ সমর্থক লিটনদা। বলল, "ওঁর মতো জিনিয়াস আর কে আছে বল!" আর যখন এই রকম এক জিনিয়াসকে নিয়ে ফুটবল দুনিয়ায় তোলপাড় হচ্ছে, তখন লিটনদা চুপ করে বসে থাকবে, তা তো আর হয় না। লিটনদার অতর্কিত আক্রমণে তো আমি থ!

কিছু বলার আগেই সামনে রাখা আলুর চপের ঠোঙা থেকে একটা চপ মুখে চালান করে দিয়ে লিটনদা বলল, "সব মানুষেরই ভুল হয় এবং জিনিয়াসরাও এর ব্যতিক্রম নন। ক্ষণেকের একটা ভুলের জন্য রাতারাতি বিশ্বসেরাকে তোরা সবাই খলনায়ক করে দিলি? তোদের লজ্জা করে না?"

আমি আমতা-আমতা করে বললুম, "বিদায়ী ম্যাচে নিজের সুনাম এভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন জিজু? আমার তো মনে হয়, ম্যাচের শুরু থেকেই জিজুর মাথা গরম ছিল, আর গোটা ঘটনায় মাতারাৎজির কোনও দোষ নেই? ইতালীয় কোচের কৌশলেই ম্যাচে ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিলেন জিদান..."

মাঝপথে হুঙ্কার দিয়ে উঠল লিটনদা, "থাম তো! দু'টো ম্যাচ দেখেই একেবারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিস দেখছি। একটা লোকের মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। মাথার অসম্ভব চাপ নিয়ে মাঠের লড়াইয়ে নামা মানুষটাকে মাঝমাঠে ক্লেজিং করা...এটাকে অসভ্যতা ছাড়া আর কী বলা যায়? জিদানকে তো গালি দিয়েছেন তোদের মাতারাৎজি!"

লিটনদার এ ধরনের 'জিজুভক্তি' আমার বাড়াবাড়ি মনে হল। আমি প্রতিবাদ করার জন্য বলতে যেতেই লিটনদা গলা চড়িয়ে বলল "টেলিভিশন স্ক্রিনে পুরো ব্যাপারটা জিদানকে লাল কার্ড দেখানোটা মোটেও ঠিক হয়নি। তা ছাড়া স্ক্রিনে দেখে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া তো ফিফার সম্পূর্ণ নিয়মবিরোধী। বিশ্বকাপে ওঁর পাওয়া সোনার বলটাও তো কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল। তবে যাই হোক, সেটা আর এখন হচ্ছে না। তবে ফিফার ৬,০০০ ডলার জরিমানা করাটাও আমার কাছে বড্ড বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে!"নিজস্ব ঢঙে তার প্রিয় জিজুকে ডিফেন্ড করল লিটনদা।

মনে-মনে সাহস সঞ্চয় করে বললুম, "কিন্তু লিটনদা, মাতারাৎজি ঠিক কী বলেছিলেন, তা তো আমরা কেউই জানি না। আর তুমি যে বলছ, টিভিতে দেখে লাল কার্ড দেখানোর ব্যাপারটা... ফিফা তো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।"

"তা তো করতেই হবে নইলে ওদের সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে যে। ওই যে তোরা যাকে মাথায় তুলে নাচছিস লিপ্পি না কী, ইতালীর কোচ! তিনিই তো ফলাও করে সাংবাদিকদের বলেছেন যে, টেলিভিশন স্ক্রিনে ঘটনাটা দেখেই জিজুকে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব তো চক্রান্ত!"

"চক্রান্ত?"

"আলবাত।"

"ফিফা তো লিপ্পির কথাকে পাত্তা দেয়নি, ফিফা বলেছে রেফারি সহযোগী রেফারির সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

"ও তো ওদের লোক দেখানো ভড়ং।"

চার নম্বর চপে হাত বাড়াল লিটনদা। বৃষ্টির তোড় আরও বেড়েছে, মনে হচ্ছে আজ সারারাত এরকমই চলবে। আমাকে জম্পেশ করে লেকচার দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে লিটনদা। ডিনারে খিচুড়ি আর ডিমভাজার ফরমায়েশ করে লিটনদা বলল, "তোরা তো জিদানের ঢুঁসো মারার কথাই বলছিস, একবার ভেবে দ্যাখ, জিদানকে জব্দ করার জন্য এটা তো একটা ইতালীয় চালও হতে পারে। একজন জিনিয়াসকে তাঁর জীবনের শেষ ম্যাচে ইচ্ছে করেই ফাঁসানো হয়েছে। আর এই যে জীবনের শেষ ম্যাচে লাল কার্ড দেখানোর স্মৃতি, এটাও তো ওঁকে সারাজীবন বইতে হবে! সেটাও কি খুব একটা স্বস্তির?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "তা তো নয়ই। ট্র্যাজেডির নায়ক হিসেবে কোনও দিন জিদানকে দেখব, তা আমিও ভাবিনি। এত বড় ফুটবলারের শেষ ম্যাচটা তো আরও বর্ণময় হতে পারত! হাজার হোক, স্রেফ একটা ঢুঁসো মারার জন্য জিদান ফুটবল দুনিয়াকে কলঙ্কিত করেছেন, এমনটা আমিও মনে করি না।"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে লিটনদা বলল, "যা বলেছিস, ট্র্যাজেডি হোক বা না হোক, জিজুর জবাব নেই!"

সুমন সেনগুপ্ত

আবার হইহই করে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল লন টেনিসের সেরা টুর্নামেন্ট। ফেডেরারের রেকর্ড, জমজ ভাইয়ের খেতাব জেতা, চিনের চমক, নানা খবরে ভরা এবারের উইম্বলডন। লিখেছেন শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বব ও মাইক ব্রায়ান

এমিলি মরেসমো

জি ইয়ান ও জিয়ে ঝেং

জমজমাট উইম্বলডন

ফোরহ্যান্ড

জুন-জুলাই মাসের খবরের কাগজগুলো ফুটবল বিশ্বকাপের গল্পে বোঝাই থাকলেও, সত্যিকারের খেলাপাগল মানুষ কিন্তু চোখ রাখতে ভোলেনি উইম্বলডন টুর্নামেন্টের কাণ্ডকারখানায়। যেখানে পুরুষদের সিঙ্গলসে ক্লে-কোর্ট মাস্টার রাফায়েল নাদালকে হারিয়ে আবার ট্রোফি জিতে নিয়েছেন রজার ফেডেরার। ফুটবল ফাইনালে ফ্রান্স ছিটকে গেলেও, দেশের মানুষদের মুখে অন্তত খানিকটা হাসি ফুটিয়েছেন মহিলাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন এমিলি মরেসমো। আর, পুরুষদের ডাবলসে দারুণ সম্মানের এই খেতাবটা জিতে নিয়েছেন আমেরিকার বব ব্রায়ান এবং মাইক ব্রায়ান, ফ্রান্সের ফেব্রিচ সানতোরো আর সার্বিয়ার নেনাদ জিমোনিক জুটিকে হারিয়ে। মেয়েদের ডাবল্‌সে এবার সফলতম চিন। জি ইয়ান এবং জিয়ে ঝেং, স্পেনের হুয়ানো পাসকুয়াল আর আর্জেন্তিনার পাওলা সুয়ারেজকে হারিয়ে দেন। মিক্সড ডাবল্‌সে এবার হেভিওয়েট ফেভারিটরা কিন্তু হেরে গিয়েছেন। বব ব্রায়ান আর ভেনাস উইলিয়ামস দাঁড়াতে পারেননি ইজরায়েলের অ্যান্ডি র‍্যাম এবং রাশিয়ার ভেরা জ্বোনারেভার কাছে।

এ তো গেল হারজিতের তালিকা! এবারের উইম্বলডন কিন্তু আমাদের মনে থাকবে অনেক কারণে। রজার ফেডেরারের কথাই ধরা যাক। সুইজারল্যান্ডের এই অসাধারণ খেলোয়াড়টির চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা যেন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে! অন্তত ঘাসের কোর্টে তো বটেই। এই নিয়ে, পিট সাম্প্রাসের মতোই, চারবার উইম্বলডন খেতাব জিতলেন ফেডেরার; একই সঙ্গে ছুঁয়ে ফেললেন আর-এক টেনিস তারকা বিয়র্ন বর্গের পরপর ৪১টি ম্যাচ জয়ের রেকর্ডও। আর-একটা উইম্বলডন খেতাব জিতলেই ফেডেরার আবার ছুঁয়ে ফেলবেন বর্গকে। আর সেটা বোধ হয় মোটেই অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

অন্যদিকে, এমিলি মরেসমো ফ্রান্সকে চ্যাম্পিয়ন করলেন দীর্ঘ ৮১ বছর পর! সেই কবে ১৯২৫ সালে সুজান লেংলঁ কাপ জিতেছিলেন, তারপর আর কোনও পাত্তাই নেই ফ্রান্সের! এই ২০০৬-এ এসে সেই খরা কাটল।

উইম্বলডনের কয়েক দিন আগেই শেষ হয়েছিল ফরাসি ওপেন। প্রথমটায় ঘাসের কোর্টে খেলা হয়; আর দ্বিতীয়টায় ক্লে কোর্টে। এই দু'টো খেলা তুলনা করলে বেশ বোঝা যায়, টেনিস খেলোয়াড়রা এখন স্পেশ্যালাইজেশনের দিকে ঝুঁকছেন। মানে, ফেডেরার যদি ঘাসে কাঁপাবেন, তো নাদাল চমকে দেবেন ক্লে কোর্টে। উইম্বলডনে ফাইনাল ম্যাচে ফেডেরার হারালেন নাদালকে, আর রোলাঁ গারোয় ঘটল ঠিক উলটো কাণ্ড! ফরাসি ওপেনে মেয়েদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বেলজিয়ামের জাস্টিন এনা আর্দেন। সেই জাস্টিনই উইম্বলডনের ফাইনালে হেরে গেলেন মরেসমোর কাছে। অবশ্য, মরেসমো জাস্টিনকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু সে জয়ে এমিলিকে কেউ বাহবা দেননি। কারণ, এনা আর্দেন চোটের জন্য গোটা ম্যাচটা খেলতেই পারেননি। এবার উইম্বলডন খেতাব জিতে মরেসমো কিন্তু নিজের জাত চিনিয়ে দিয়েছেন!

চিনের নাম এই প্রথম উইম্বলডনজয়ী দেশের তালিকায় ঢুকে পড়ল। জি ইয়ান এবং জিয়ে ঝেংয়ের অসাধারণ খেলার জন্য। তাঁদের প্রতিপক্ষ হুয়ানো পাসকুয়াল এবং পাওলা সুয়ারেজ আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, রোলাঁ গারো, ইউ এস ওপেন জিতলেও, এবার আর পারেননি।

বব আর মাইক ভাইও ঢুকে পড়লেন ইতিহাসের পাতায়। ডাবল্‌স টিমে চারটে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টই জেতার তালিকায় তাঁদের নাম থাকবে তিন নম্বরে। উইম্বলডন-ডায়েরির পাতায় আরও কিছু খবর দেওয়া যেতে পারে। যেমন, এক ঘণ্টারও কম সময়ে মিক্সড ডাবল্‌সের খেলায় অ্যান্ডি র‍্যাম এবং ভেরা জ্বোনারেভা উড়িয়ে দেন বব ব্রায়ান আর ভেনাস উইলিয়ামসকে। প্রৌঢ়া মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা এবারও অংশ নিয়েছেন উইম্বলডনে!

এরকমই আরও কিছু চমক দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করব আগামী উইম্বলডন পর্যন্ত।

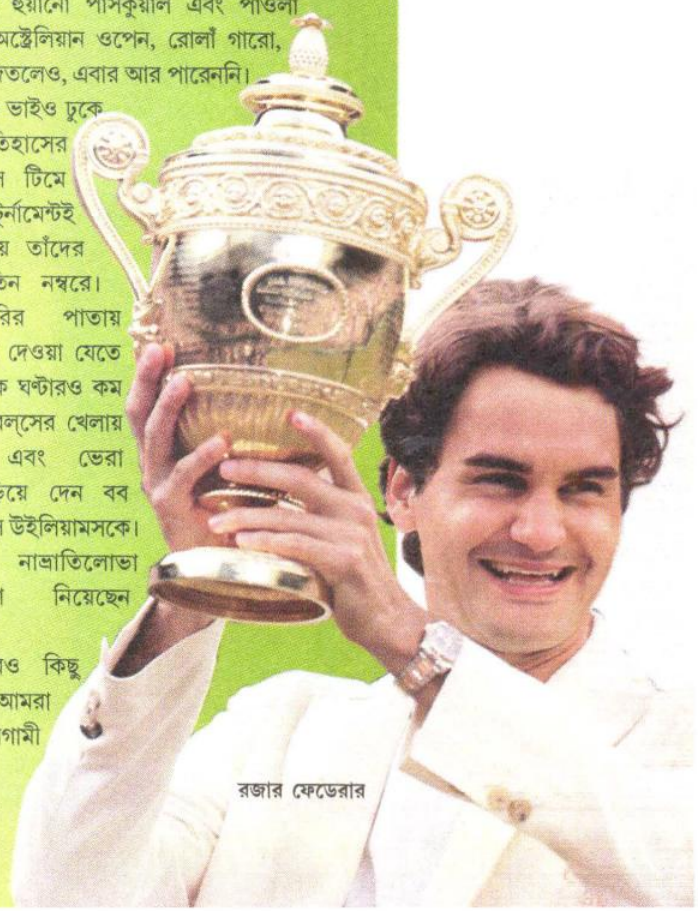
রজার ফেডেরার

‘হল অব ফেম’-এ সাবাতিনি

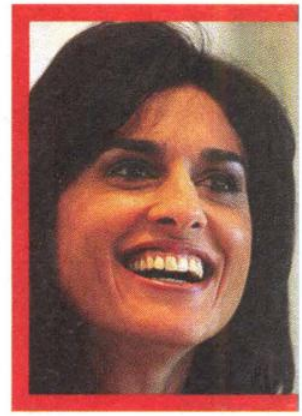

মাত্র ১৪ বছর বয়সে পেশাদার টেনিস সার্কিটে পা রেখেই সাড়া জাগিয়েছিলেন। ইউ এস ওপেনে প্রথম ম্যাচ জিতে উঠে এসেছিলেন সংবাদের শিরোনামে। ১৯৯০ সালে ফ্ল্যাশিং মেডোয় ইউ এস ওপেনের ফাইনালে স্টেফি গ্রাফকে হারিয়ে আর্জেন্তিনার প্রথম মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনি। ১৯৮৮ সালে স্টেফির সঙ্গে জুটি বেঁধে জিতেছিলেন উইম্বলডনের ডাবল্‌স খেতাব। টেনিসের গ্ল্যামার গার্ল হয়ে ওঠা ‘গ্যারি’ অবশ্য একটির বেশি গ্র্যান্ড স্লাম পাননি। ১৯৯৬ সালে পেশাদার টেনিস থেকে সরে দাঁড়ানোর আগে টানা ১০ বছর বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১০ জনের মধ্যে ছিলেন। ২৭টি সিঙ্গল্‌স এবং ১৪টি ডাবল্‌স টাইটেলের মালিক সাবাতিনি এবার ‘হল অব ফেম’-এ অভিষিক্ত হলেন। দু’ বছর আগেই যিনি এই সম্মান পেয়েছিলেন, সেই স্টেফি গ্রাফ রোডস আইল্যান্ডের এক অনুষ্ঠানে এই ক্লাবের নতুন অতিথিকে স্বাগত জানালেন।

অলিম্পিকে সোনা জিততে চায় চার বছরের বুধিয়া

পুরী থেকে ভুবনেশ্বর। একটানা ৬৫ কিলোমিটার দৌড়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল চার বছরের বালক বুধিয়া। পরে তা নিয়ে কম বির্তক হয়নি। এত অল্প বয়সে তার এই দৌড়কে চিকিৎসকেরা তো শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করেন।

ইতিমধ্যে ওড়িশার এই বিস্ময়বালকের একপ্রস্থ ডাক্তারি পরীক্ষাও হয়েছে। যদিও এসব বির্তক নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতে চান না বুধিয়ার কোচ বিরঞ্চি দাস। বুধিয়াও চায় দৌড়তে। কিছু দিন আগেই রাজস্থানের জয়পুরে স্থানীয় অ্যাম্বাসি মিলেনিয়াম স্কুলের পক্ষ থেকে ‘অ্যাম্বাসি লিটল স্টার’ পুরস্কার দেওয়া হল বুধিয়াকে। স্কুলছাত্রদের সঙ্গে কিছুক্ষণ দৌড়ে অংশ নিয়ে বুধিয়া জানিয়েছে, “বড় হয়ে আমি অলিম্পিকে সোনা জিততে চাই।”

নতুন প্রতিভার খোঁজে স্টিভ ওয়

এ দেশ থেকে এবার ক্রিকেট প্রতিভা খুঁজে বের করতে চান ক্রিকেটার স্টিভ ওয়। শুধু ক্রিকেট খেলার সূত্রেই নয়, এ দেশের সঙ্গে প্রাক্তন এই অস্ট্রেলীয় অধিনায়কের একটা অন্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অনেক দিন। কলকাতায় খেলতে আসার পর এ রাজ্যের দুস্থ ছেলেমেয়েদের একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের নানাভাবে সাহায্য করেন তিনি। শোনা গেল, নতুন প্রতিভার সন্ধানে একটি রিয়েলিটি টিভি শো করতে চেয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে চিঠি দিয়েছেন স্টিভ। এদিকে সহারা ওয়ান সংস্থাও নাকি বোর্ডের কাছে একই রকম একটি টিভি শো করার প্রস্তাব দিয়েছে। এখন কে পাবেন এই দায়িত্ব, তা নিয়ে শুরু হয়েছে লড়াই। তবে দায়িত্ব পেলে স্টিভ দাবি করেছেন, তাঁর শো অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং উঠে আসবে অনেক নতুন প্রতিভা।

ম্যাঞ্চেস্টার কাপে খেলবে মোহনবাগানের ছোটরা

ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড প্রিমিয়ার কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে যাচ্ছে মোহনবাগান আকাদেমির খুদে ফুটবলাররা। ৮-১১ অগস্ট এই প্রথম ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আর্সেনাল, ইন্টার মিলান, ম্যাঞ্চেস্টার ছাড়াও আর্জেন্তিনা, জার্মানির মতো বিশ্বের সেরা ২০টি দলের সঙ্গে খেলবে অমিত সাহা, রাজীব ভট্টাচার্য, বাপি চৌধুরী, মালসাম্মা জুয়ালারা। সিঙ্গাপুরকে ফাইনালে হারিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সেরা দল হয়ে মূলপর্বে গিয়েছে মোহনবাগান। ওয়েন রুনি, থিয়েরি অঁরিদের ক্লাবের বিপক্ষে কোচ শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেরা কেমন খেলে, এখন সেটাই দেখার।

হার্ডলসে লিউ ঝিয়াংয়ের নতুন নজির

গত আথেন্স অলিম্পিকে ১১০ মিটার হার্ডলসে ১২.১৯ সেকেন্ড সময় করে সোনা জিতেছিলেন। শুধু সোনা জেতাই নয়, ওই সঙ্গে ১৯৯৩ সালে ব্রিটেনের কলিন জ্যাকসনের গড়া বিশ্ব রেকর্ডটিও ছুঁয়ে ফেলেছিলেন চিনা অ্যাথলিট লিউ ঝিয়াং। কোনও স্প্রিন্ট ইভেন্টে অলিম্পিক থেকে দেশকে প্রথম সোনাটি এনে দেওয়ার পর এই সেদিন কলিন জ্যাকসনের হাত থেকে বিশ্ব রেকর্ডটি এবার পুরোপুরি কেড়ে নিলেন লিউ। অ্যাথলেটিসিমা গ্রাঁ প্রি-তে ১২.৮৮ সেকেন্ড সময় করে নতুন নজির গড়ে খবরের শিরোনামে উঠে এলেন এখন তিনি।

চন্দন রুদ্র

কথা হল ত্বকের সুরক্ষার...

তাও আবার শুধু সাবান দিয়ে?

IPSA

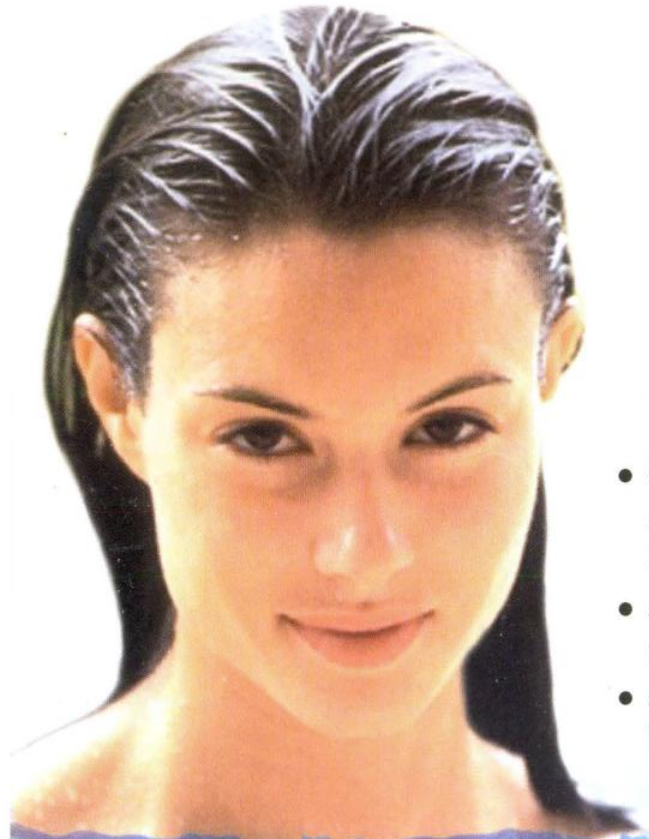

3-in-1
Moisturizer+Scrub+Soap

- Scrub of Neem, Khas, Manjistha & Almond - removes dead cells without harming skin.
- Aloevera & Cucumber - moisturizes and nourishes the skin.
- Acts as a deodorant & keep you fresh throughout the day.

এই না হল কথা!

Eraser Skin Care Range

- **Eraser P.A.** :- The only 100% Antimarks cream - Removes Scar naturally
- **Eraser Ultra Fair** :- An Ayurvedic fairness cream
- **Eraser Herby Cool** :- Prickly Heat Powder
- **Eraser Plus** : - Anti Marks + Fairness Cream
- **Eraser Face Wash**
- **Eraser Face Scrub**
- **Eraser Foot Cure** :- For Curing of cracked feet
- **Eraser Acne & Pimple** : - Natural Treatment for Acne & Pimple
- **Eraser Dry Face Pack**
- **Eraser Boro Aloe** :- An Ayurvedic Antiseptic Cream - Say Bye-Bye to dry skin
- **Eraser Wet Face Pack** :- For Fairness & Wrinkle free skin

NIYATI

ANANDAMELA AUGUST 2006 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI No. 27057/75 LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06 INR 10.00

Intense protection, light feel

3-in-1 Matte-Look Daily Sunblock SPF-40

Sun Protection Break Through

- রোদ থেকে ব্যাপক সুরক্ষা
- ত্বক উজ্জ্বল করে
- ম্যাটিফাইং এফেক্ট

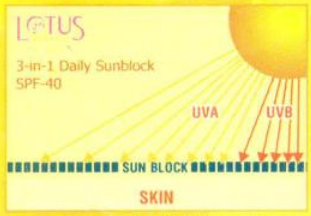

Broad spectrum UVA & UVB protection by **Safe Sun 3-in-1 Daily Sunblock** with skin lightening & mattifying effect

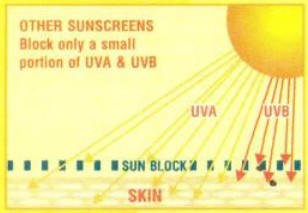

Other sunscreens block only a small portion of UVA & UVB rays, are oily & sticky on the skin

EXTREME
Sun Block Cream
SPF 60

KIDS
Sun Block Cream
SPF 25

REPLENISUN
After-Sun Gel

BEAUTY AWARD COSMOPOLITAN WINNER

www.lotusherbals.com

LOTUS HERBALS
SAFE SUN
Advanced Protection System

For your free Sun Care Guide write to: **Lotus Herbals Sun Care** T-34, Okhla Ind. Area, Ph-II, N. Delhi-20, or e-mail us at: care@lotusherbals.com